BANGLA KOUNTERKULTURE ARCHIVE MAGAZINE

ODDJOINT

006 / SEPTEMBER 2015

কভার ফটো: কিউ

ODDJOINT # বাংলাব্ল্যাক্

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

ভাদ্র ১৪২২ ● সেপ্টেম্বর ২০১৫

১. চিঠি : উৎপলকুমার বসু

৪৫ বছর আগে লেখা উৎপলকুমার বসুর এই চিঠিটি আজও কলকাতার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ভীষণ সত্য। সেই সত্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এখানে চিঠিটি আবার প্রকাশ করা হল।

লন্ডন
৬ই জানুয়ারি ১৯৭০

প্রিয় সন্দীপন,

আপনার পাঠানো ‘বুজ’ পত্রিকায় সুবো আচার্য লিখিত একটি প্রবন্ধ (নাম আমার জেনারেশন বিষয়ে ব্যক্তিগত) পড়েছি এবং এ-বিষয়ে আমার দু’একটি কথা বলার আছে। আপনার পত্রিকায় এই চিঠিটা ছাপবেন যদি স্থানাভাব না হয় এবং যদি ছাপান তবে পুরোটাই ছাপাবেন।
ওই লেখাটির প্রধান গুণ সরলতা বা ইংরেজিতে যাকে বলে ডিরেকটনেস কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার দু’একটি জায়গা বুঝতে অসুবিধে হয়েছে যদিও আমি নিজের মতো একটা মানে করে নিয়েছি ওই কঠিন অংশগুলির এবং সেই মতোই এই চিঠি লিখছি। আমার বোঝায় ভুল থাকলে আপনারা, বলা বাহুল্য, আমাকে সংশোধন করে দেবেন।
কলকাতা শহর কারা চালায়? অধ্যক্ষরা, মন্ত্রীরা, ব্যবসায়ীরা, চিত্রপরিচালকরা, খবরকাগজওয়ালারা এবং মালিকেরা ও বিদেশি কোম্পানি, জুট মিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, অসংখ্য ছোটোখাটো কলেজ, তাদের অধ্যাপকরা—এঁরাই কলকাতা শহর চালান। এঁদেরই ব্যবহারের জন্য কলে জল পড়ে, এঁদেরই অর্থবৃদ্ধির জন্য সিনেমা তৈরি হয়, বই লেখা হয়, ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় পাশ করে। এঁদের অ্যাক্ কথায় বলা চলে ‘প্রতিষ্ঠান’ এবং সেই প্রতিষ্ঠানেরই উপকারে লাগি আমরা।
যতদিন এই প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্ষমতা এবং পয়সা আছে ততদিন সমরেশ বসু আন্তরিক না বিমল কর আন্তরিক এই প্রশ্ন হাস্যকর কেননা উভয়েই ওই প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগছেন। প্রতিষ্ঠান উপকৃত হচ্ছে উভয়কে দিয়েই। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছামতো অমুক লেখক আধ ইঞ্চি বেশি আন্তরিক হল এই শারদীয় সংখ্যায়—সামনের বছর অন্য কেউ দেড় ইঞ্চি

ছবি: সম্বরণ দাস

উৎপলকুমার বসু

আন্তরিক হবেন। এই ষড়যন্ত্র কতখানি গভীর এবং ব্যাপক তা প্রত্যেক তরুণ লেখকের, আজ, বাংলাদেশে, বোঝার সময় এসেছে এবং এখনি সময়, ওই প্রতিষ্ঠানকে আমূল উপড়ে ফেলার। তার জন্য দুটি জিনিস দরকার (এক) ভাষা, (দুই) বন্দুক। প্রথম ভাষা ব্যাপারটিকে ধরা যাক। আমরা যে বাংলা ভাষায় আজ কথা বলি বা লিখি তা মোটামুটি রবীন্দ্রনাথেরই তৈরি হয়েছে। এবং আমি বা আপনি এটা যতো না ভালো জানি, প্রতিষ্ঠান জানে আরো ভালোভাবে। সুতরাং আমাদের শাসনের জন্য, আমাদের সর্বস্ব গ্রাস করার জন্য ওই ভাষাই ব্যবহৃত হচ্ছে। ওই ভাষায় 'আত্মার স্বাধীনতা' ঘোষণা করা যায় না এবং 'আত্মার স্বাধীনতা' ঘোষণা যদি কবিতা হয়, তবে ওই ভাষঅয় আজ আর কবিতা লেখাও চলে না। অর্থাৎ 'বাংলা ভাষা'তেই কবিতা লেখা অসম্ভব।

কিন্তু বাংলা ভাষা মানে রবীন্দ্রনাথের ভাষা নয়। এবং কবিতা কী? মেদিনীপুরে একবার এক মহিলা কথাচ্ছলে বলেছিলেন

চাষা কিবা বোঝে ঘি-এর মর্ম
আনে কর্পূর লাগায় পোঁদে

বস্তুত ওই উক্তির গম্ভীর সারল্যে আমি অভিভূত হয়ে যাই এবং আজ আমার মনে হয় 'রূপনারানের তীরে জেগে উঠিলাম' যদি অবিনাশী কবিত্ব হয়, তবে ওই মহিলার উক্তি অধিকতর অবিনশ্বর। (দ্রষ্টব্য কে রবীন্দ্রনাথ সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী পৃ. ১০২, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়)

সুতরাং, আমাদের নির্মমভাবে, এক নতুন ভাষা তৈরি করা দরকার। আমাদের প্রচলিত বাক্যরীতি, শধব্যবহার সমস্তই বর্জন করে এক অভিনব গদ্য তৈরি করা দরকার যা দিয়ে নাটক, কবিতা, গল্প সবই লেখা চলে। এর জন্য আমাদের খুঁজে বের করতে হবে গ্রামের শধ, লৌকিক বাক্যরীতি, আসামী উড়িয়া বিহারী বাক্যরীতি—আমাদের যে নতুন ভাষা তৈরি হবে তা হল ওই বিভিন্ন ভাষা পদ্ধতির সমন্বয়। আমরা ত্রাণ করতে পারি একমাত্র ওই নতুন ভাষা দিয়ে। আর পারি বন্দুক দিয়ে।

কেননা কর্তারা অনেকদিন হল ভুলে গেছেন ভয় কাকে বলে। লাইসেন্স নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, কারণ যে কাজে ওই মারণাস্ত্র ব্যবহার হবে তার জন্য পৃথিবীর কোনো সরকারই কোনোদিন লাইসেন্স দেয়নি। আমরা কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে, জলের পাইপ বেয়ে, রাত্রির অন্ধকারেতে উঠে যেতে চাই প্রিন্সিপালের শোবার ঘরে। ওখানেই আমরা তাঁর ইন্টারভিউ নিতে চাই। ভয় হচ্ছে সেই বস্তু যা শয়তানকে দিয়েও সত্য কথা বলায়। বলা বাহুল্য, প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসে প্রথমে আপনাকে নানারকম বোঝানোর চেষ্টা করবে। প্রতিষ্ঠান বলবে ও হে, না হে, এটা ভালো নয়। আপনার তখন খুবই ইচ্ছে হবে তর্ক করে পরাস্ত করার। (কেননা আপনার গায়ে তখনও শিক্ষিতের দুর্গন্ধ লেগে আছে) প্রতিষ্ঠানই আপানকে বুঝিয়েছে আপনি বুদ্ধিমান, যেহেতু আপনি তর্ক করেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠান যখন আপনার হাত থেকে ছোঁ মেরে পয়সাগুলো কেড়ে নেয় তখন সে আপনাকে তর্কের অবকাশ দেয় কি? ধরে নিলাম, আপনি ওই ফাঁদে পা দিলেন না, কেননা আপনি তেমন লেখাপড়া করেননি। তখন প্রতিষ্ঠান বলবে ওহে, অবণীবাবুকে মেরো না, ধরণীবাবুকে মারো। অর্থাৎ আপনার মনে সন্দেহ জাগানোর চেষ্টা করবে। আপনি যদি ভাবতে শুরু করেন তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার চিন্তা কেটে যাবে, কারণ নিজে শুনবেন পুলিশের বাঁশি ডাকছে।

তরুণ লেখক! আপনার উদ্দেশ্য হত্যা। আপনার লক্ষ্য ভায়োলেন্স। আপনি এতদিনে বুঝেছেন কবিতারই অপর নাম কার্তুজ এবং কবির অস্তিত্ব শতকরা একশোভাগ পলিটিক্যাল। প্রতিষ্ঠান আপনাকে আরো নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করবে। সে ব্যবহার করবে আপনারই অতিপরিচিত শঠ শধগুলি। সে বলবে তবে কি তোমরা সশস্ত্র বিপ্লব চাও (খবরের কাগজের ভাষা ওই প্রতিষ্ঠানেরই অভিনীত)। আপনার তখন চিৎকার করে শুধু একটাই ঘোষণা করার থাকবে আমি চাই কবিতা। আমরা চাই বন্দুক। আমরা, আজ, চাই কবিতা ও বন্দুক। এর মাঝামাঝি কোনো রফা নয়।

ইতি
উৎপলকুমার বসু ■
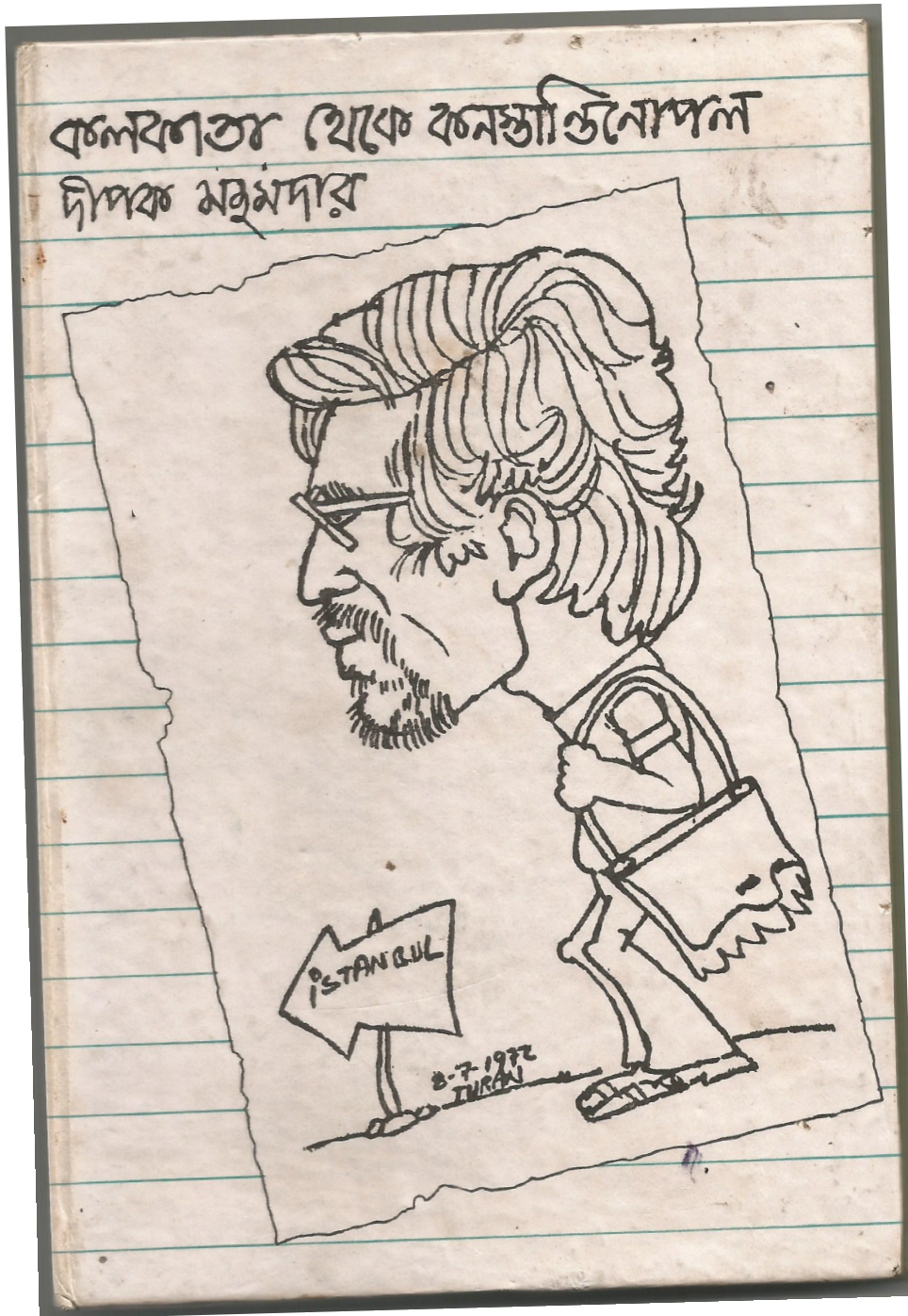
Kolkata Theke Constantinople

A Travelogue in Bengali by Deepak Majumdar

প্রথম প্রকাশ

পয়লা বৈশাখ, ১৩৯৬ | ১৪ এপ্রিল, ১৯৮৯

প্রচ্ছদ পরিচয়

রূপকল্প : হিরণ মিত্র

ব্যঙ্গচিত্র : তুরান, বর্তমান তুরস্কের খ্যাতনামা চিত্রকর

প্রকাশক

সুরজিৎ ঘোষ

প্রমা প্রকাশনী

৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ | কলকাতা-১৭

মুদ্রক

কালাচাঁদ ঘোষ

বাণী আর্ট প্রেস

১১, নরেন সেন স্কোয়ার | কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

৭/১ বিধান সরণী | কলকাতা-৬

দশ টাকা

শুভলক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়
করকমলেষু
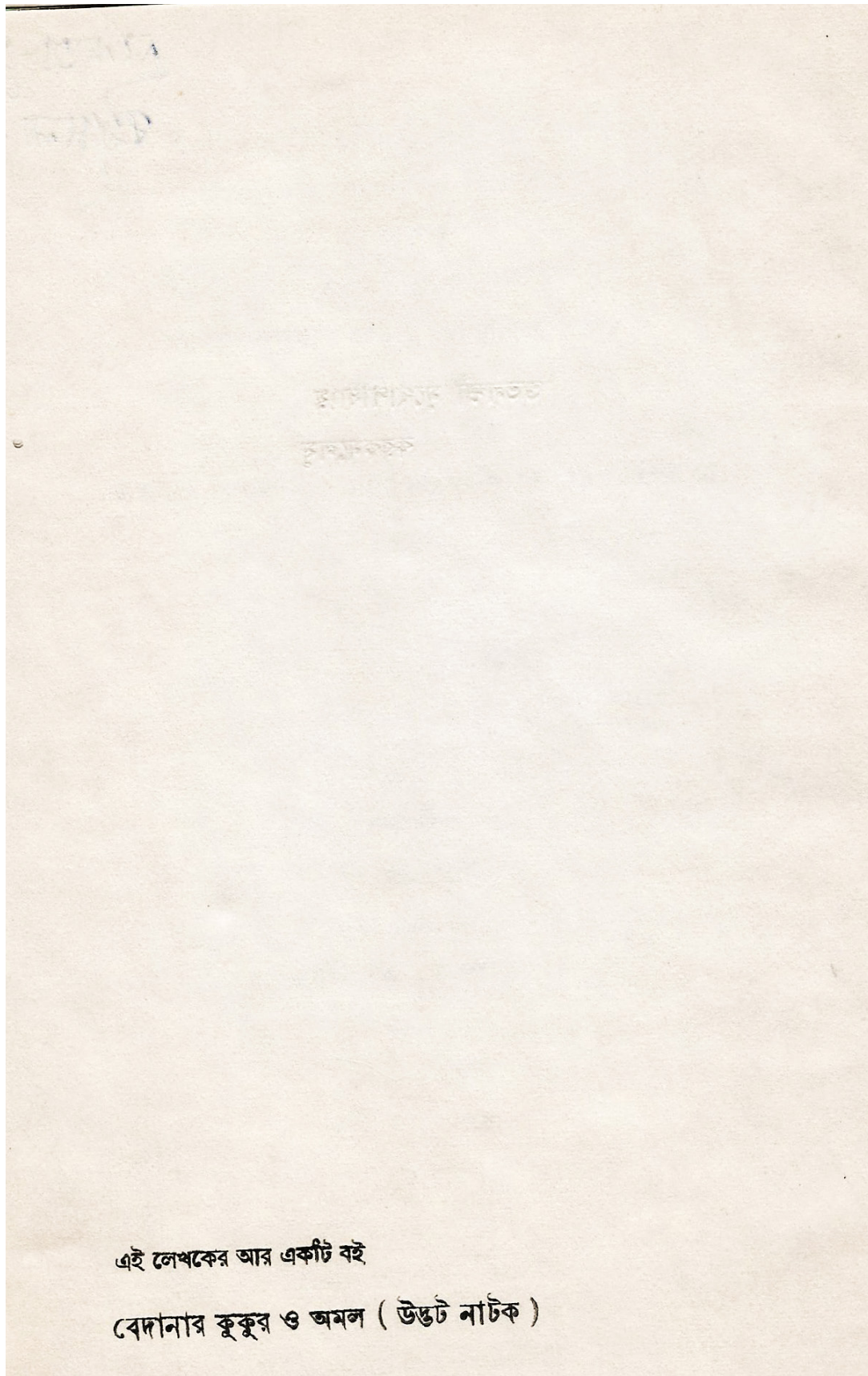
এই লেখকের আর একটি বই

বেদানার কুকুর ও অমল (উদ্ভট নাটক)

এক যুগের ওপর পেরিয়ে গেল। এই খণ্ডকাহিনীমালা যেসব উপলব্ধির সঙ্গে জড়ানো তাদের তাৎপর্য আজ তীক্ষ্ণতর। য়ুনানীস্তান তার গণতন্ত্রের আবহাওয়ায় সোক্রাতিস-এর ভীড় বাড়িয়ে তুলছে। আফগানিস্তান তার স্বপ্নের জন্য দণ্ডিত, বিপর্যস্ত। তুরস্ক আজও আরোগ্যপ্রার্থী। তৃতীয় বিশ্ব নিজের দিকে তাকিয়ে গেয়ে চলেছে 'নিঠুর আরো কি বান'।

এই তাৎপর্য মর্মে রেখেই সহপ্রাজক পাঠকদের জন্য আখ্যানপুঞ্জটি প্রকাশিত হল। আত্মীয়-জগৎ-সংবাদ যদি তাতে অন্য ধরনের মর্যাদা পায় তাহলেই আমি তৃপ্ত। তখন ঘুরতে ঘুরতে মনে হত একই জায়গায় বুঁদ হয়ে আছি। এখনো সেই মানব-সংসারী প্রকৃতিই আমার নেশা। আনন্দবাজার পত্রিকায় গত দশকে প্রকাশিত হবার সময় অনেকেই উৎসাহিত বোধ করেছিলেন। বেলঘরিয়া থেকে সত্তরোর্দ্ধ ভ্রমণ নেশাগ্রস্ত প্রবীণ কিশোর জ্ঞানবাবু বাড়ি এসে নানা প্রশ্নে উজ্জীবিত করেছিলেন প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্যের সন্ধি-দেশগুলোর মানুষের ভাবনা প্রসঙ্গে। তাঁকেও স্মরণ করি। সুরজিৎ ঘোষ-এর আগ্রহ ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। আশা করি বাঙালির ভবঘুরেমি এর ফলে অন্যতর মাত্রা পাবে।

দীপক মজুমদার

কলকাতা

২০-৩-৮৯

কৃষ্ণসাগর থেকে নীল ওড়না উড়িয়ে তুলতে তুলতে অন্যমনস্ক বসফরাস এসে থমকে দাঁড়ায় ঈজীয় সাগরের সামনে। ওপাশে খেলার সঙ্গী দার দীনেল। তারপরই শুরু হয় এদের আত্মহারা উদ্দাম অভিযান। তুরস্কের পশ্চিম তটে দাঁড়িয়ে আছে হজমীর ওরফে স্মিরনা, মহাকাব্যের অবিশ্বাস্য ট্রয়, বীরত্ব ও একাকীত্বের গাথা সমবায়। আরো নীচে বীণাবাদিনী সাফোর লিসবস, যণ্ডদানবের ক্রিটি, অকস্মাৎ তারই পর পৃথাকুমারীর নিটোল নাভি, নাভিসাগর ভূমধ্যসাগর, অলৌকিক পায়েসের বাটি। বসফরাস সেখানেই হারিয়ে যায় লুপ্ত মহাদেশ আটলান্টিস-এর সঙ্গে। কুড়ি মিনিট সময় লাগে মাত্র তিন বছর বয়সের ফুরফুরে ব্রিজটির ওপর দিয়ে হেঁটে এশিয়া থেকে ইউরোপে পৌঁছোতে। হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে কোনো দামাল-তুর্কী সাঁতরে পার হচ্ছে বসফরাস, এক গাঁট্টাগোট্টা রুশী-অর্ণব সশব্দে হাই তুলে বসলো কিম্বা রোমাঞ্চিত সফরীর মতো কিছু ইতস্তত ছুটে বেড়ানো পারাপারের খেয়া।

আমার কাছে এই পথে তিনবার যাতায়াতের যে হিশেব আছে তাতে মনে হয়, ইতিমধ্যে ডলার-রুবলের যতো ভেল্কিই ঘটে থাকুক না কেন কলকাতা থেকে যদি সরাসরি কেউ সন্ত সোফিয়ার শহর কনস্তানতিনোপলে পৌঁছে যেতে চায়, স্থলপথে তাহলে তার সময় লাগবে বারো দিন, টাকা খরচ হবে শ পাঁচেক। খোলা মনে, হাল্কা ওজনে চলাফেরার অভ্যেস থাকলে, আরো কম-খরচে অনায়াসে হিমালয়

ভেদ করে পৃথিবীর ছাদের ওপর দিয়ে মুগ্ধচিত্তে বেড়িয়ে এই প্রাচীন ট্রয়, মধ্যযুগীয় বৈজয়ন্তীধাম বা বাইজান্টিয়াম-এ হাজির হওয়া যায়। একবার যদি সেই উত্তেজক ঘটনাটি ঘটে যায় তাহলে তো সারা ইউ-রোপ ঘুরতে, পাথেয় ব্যাপারে অন্তত কোনো খরচ নেই। কারণ যে হিচহাইকিং-এর কথা সিনেমা, বইপত্র ও নানা পরিচয়ের সূত্রে জানা যায় সেটা সত্যিই, রাশিয়া এবং পূর্ব-ইউরোপের দু-একটি দেশ ছাড়া সারা প্রতীচ্যেই পর্যাপ্তভাবে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব। ভেটারান হিচহাইকার হিশেবে একথা হলফ করে বলতে পারি। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই, যে, লণ্ডন, কোপেনহেগেন, ভেনিস বা স্টকহোলম—যেখানেই যাবার ইচ্ছে হোক না কেন, পাথেয় পড়ছে ওই সাকুল্যে পাঁচশো টাকা। অন্যান্য খরচ অবশ্যই আলাদা এবং তাও ইওরোপে অনেক দেশেই আপেল তুলে বা আঙুর বেছে উপার্জন করা যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবোধ এবং 'বিশ্বসাথে বিহারের' অদম্য মানবিক বাসনা নিয়ন্ত্রিত হয় বিশ্ব-রাজনীতি ও অর্থনীতির হাব-ভাব অনুযায়ী। নানা বিভ্রান্তিকর সমস্যায় জর্জরিত বর্তমান বিশ্বে মানুষের ভ্রমণের স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তাভাবনা কারা করছেন জানি না। শুনেছি প্যারিসে একটি সংস্থা আছে যার সভ্যরা নিজেদের বিশ্ব-নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং সেই সংস্থা থেকে যে স্বতন্ত্র পরিচয়পত্র সভ্যদের দেওয়া হয় বেশ কিছু দেশ নাকি তা স্বীকারও করে। ভারতীয়রা স্বভাবতই ভ্রমণ-পিপাসু, সুতরাং আশা করা যাচ্ছে আমাদের ভ্রমণ-সচেতনতা নতুন উদ্দীপনায় গড়ে উঠবে, নানা সুযোগ সুবিধেও তৈরি হবে। সম্প্রতি কলকাতার সঙ্গে লণ্ডনের সম্ভাব্য সরা-সরি রেল সংযোগের সংবাদে (পাকিস্তান-ইরান সীমান্তের কয়েকশো

কিলোমিটার ছাড়া) আমার মতো অসংখ্য মুসাফির আনন্দিত হবেন। আর তাছাড়া সবচেয়ে বেশি আনন্দের খবর তো ভারত পাকিস্তানের এতোদিনকার বন্ধ দরজা খুলে যাবার কথা। এতে কারা সুযোগ পাবেন এবং কারা পাবেন না সেটা পরের কথা। এই লেখার পর দশ বছর পেরিয়ে গেছে। মুক্ত উধাও রেলপথের গুড়ে আজও বালি।

আমাদের যাদের পথ চলাতেই আনন্দ, সেই সম্ভাবনার স্বপ্ন নিয়েও মশগুল থাকতে ভালো লাগে। বিশেষ করে সেই রোমাঞ্চকর 'রেশম পথের' কাছাকাছি ভূখণ্ডগুলি, আলেকজান্দর-দারায়ুসের সেইসব দেশ জরাথুষ্ট্র দরবেশ সুফীর সেই মানস-প্রান্তর কোন ভবঘুরেকে না পাগল করবে। ঘরকুনো বলে যতোই বাঙালীর বদনাম থাকুক না কেন দীপঙ্কর, রামনাথ বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী বা মুজতবা আলি এখনও আমাদের মধ্যে ছটফট করে।

১৯৭২-এর সেপ্টেম্বর মাস। গ্রীস থেকে স্থলপথে, মাঝখানে পাকিস্তানটুকু বাধ্য হয়েই আফগানিস্তানের আয়য়ানা এয়ারে উড়ে কলকাতায় এসেছিলাম একমাসের জন্য। আবার ওই পথেই ফিরে যাবো। আট বছর, দীর্ঘ আট বছর দেশের বাইরে। ফুল ব্রাইট বৃত্তি নিয়ে চারবছর যুদ্ধ ও অন্তর্বিক্ষোভ প্রপীড়িত আমেরিকায় আর বাকি চার বছর সেনাপতিদের কঠোর কব্জায় ম্রিয়মান গ্রীসে। সামান্য কিছু টাকা জমিয়ে অবশেষে শেকড়গুলোকে শক্ত করার চেষ্টা একটু। ইচ্ছে ছিলো দক্ষিণ রাশিয়ার সমরখন্দ, বুখারা ইত্যাদি হয়ে কাবুলের পথে ভারত উপ-মহাদেশে ঢুকবো। গ্রীষ্মের ছুটির অনেক আগে থেকেই অ্যাথেন্সের ইনটুরিস্ট সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাঁরাও প্রচণ্ড উৎসাহ দেখালেন, নানা ছবি ও কাগজপত্র পাঠালেন।

সেসব পড়ে দেখি সে-ই একই দুঃখের কাহিনী, নিজের ইচ্ছেমতো সময়ে ভ্রমণ করা যাবে না, একটা নির্দিষ্ট ভ্রমণ-সূচী ওঁদের কাছে পাঠাতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ওঁরা যাবতীয় রিজার্ভেশন করবেন। এমনকি হোটেল বদলানোও চলবে না। অনেক টাকা থাকলে সেভাবে ঘোরা যায় কিন্তু আমাদের মতো যারা মধ্যবিত্ত শিক্ষক তারা কী করে অতো বাঁধাবাঁধির মধ্যে যাই! অতএব আবাল্য সমরখন্দ দেখার শখ বাতিল করে যে পথে ফিরবো ভেবেছিলাম সেই পথেই এলাম, তুরস্ক, ইরান এবং আফগানিস্তান হয়ে। দীর্ঘ স্থলপথে ফেরার উত্তেজনা প্লেনে বা জাহাজে ফেরার চেয়ে অনেক বেশি নাটকীয়। প্রতিদিন একটু একটু করে প্রাচ্যের নানা স্বরগ্রাম ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোনো। দেশ, ভাষা, বন্ধু-বান্ধব আর নিষ্ঠুরভাবে অপ্রতিরোধ্য কলকাতা: যেখানে জন্মেছি, বড়ো হয়েছি যার রাস্তা-ঘাটেই হেঁটে হেঁটে প্রায়।

একমাস মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল। যেদিন কলকাতায় পৌঁছোলাম সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি, কাঁধে মোটামুটি ভারী ব্যাকপ্যাক আর সঙ্গে বিদেশিনী, ক্যারল। ইতিমধ্যে অজস্র ভালোবাসা, আড্ডা, প্রিয় শহরের অভিযোগ, অভিমান, স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন। যেদিন ফিরে যাচ্ছি সেদিনও তুমুল বৃষ্টি। সকাল বেলায় আমাদের বিয়ের রেজিস্ট্রেশন, একান্তই নিরাভরণ অনুষ্ঠান। বিকেলে মাকে নিয়ে বেরিয়েছি, শেষ-দিনটা বিদেশ বিভুঁয়ে থাকা একমাত্র ছেলের সঙ্গে তিনি সর্বক্ষণ থাকতে চান। ভয়ানকভাবে বৃষ্টি এসে এক বৃদ্ধা জননী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী, তার প্রবাসী পুত্র ও বিদেশিনী পুত্রবধূকে যারপরনাই নাজেহাল করলো। কী অপরূপ সেই আনন্দ, কী বিধুর তার স্মৃতি—বেদনা।

রাত্রে ট্রেন, কলকাতা থেকে দিল্লী। ফিরে যাচ্ছি, আবার কবে আসব জানি না। স্টেশনে বন্ধুবান্ধব এসেছিল। তারা সবই এই উদ্ভট বিদায়কাণ্ডে ক্ষুব্ধ, কাতর ও অভিভূত। এ তো এয়ারপোর্ট নয়! কতোদিন বাদে কোন হোমারের দেশ থেকে ছন্নছাড়ার মতো এলো আবার ফিরে যাচ্ছে সেই অসম্ভব স্থলপথেই! প্রিয় মুখচ্ছবি সব। মা আসেননি। ছেলেবেলায় যে মামার হাত ধরে আউটরাম ঘাটে জাহাজের অসংখ্য আলো দেখতাম তিনি এসেছেন। বিদায় মুহূর্তে মানুষ আবরণহীন অসহায়। ট্রেন ছেড়ে দিলো। ঘাতকের মতো বন্ধুরা তাকিয়ে থেকেছিলো, ঘাতকের মতোই আমিও সরে যাচ্ছিলাম। ক্যারল বললো: 'মিমি কাঁদছে। দেখছো সন্দীপন ট্রেনের সঙ্গে ছুটছে। অমিয়কে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।' আমার হাতে নবনীতার দেওয়া আখতারী বাঈ-এর রেকর্ড 'জোছনা করেছে আড়ি, আসে না আমার বাড়ি।' কলেজ জীবনের এক বন্ধু আসতে পারেনি। জানতাম, পারবে না। তার বাবা দু বছর আগে এই দিন রাজনৈতিক দাঙ্গায় নিহত হয়েছিলেন। ট্রেন হু হু করে ছুটছে। আমাদের ওপরের দুটো বার্থ। পাখির পালকে দুখানা ঘুমোবার থলি ছড়ানো। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে প্রায় একসঙ্গেই দুজনে বলে উঠলাম, 'শুয়ে পড়া যাক'। সবচেয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় মানুষ শুয়ে পড়তে চায়, ঘুমের আশ্রয় খোঁজে। দিল্লী-কালকা মেলে সে-ই আমাদের স্মৃতি-স্বপ্ন ও আবিশ্ব ভয়ের ধাবমান শুভরাত্রি। কিছু ফুল ছিল কাছে।

মোগলসরাইতে একটা ছোট্টো ঘটনা। ক্যারলকে দেখি অঝোরে কাঁদছে। তখনও ভোর হয়নি, শেষ রাতের দিক। কী ব্যাপার, একটা বাচ্চা ছেলে এসে ভিক্ষে চাইতে ও তাকে দুটো বিস্কুট দেয়।

ছেলেটা ফিরে গিয়ে মা আর ভাই-বোনদের থেকে একটু দূরে বসে বিস্কুট খেতে খেতে ওরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। ট্রেন তখনো দাঁড়িয়ে। ক্যারল ওর জন্য একটা কলা বের করে দিতে গিয়ে ওর ঘুমিয়ে পড়া দেখে, আর কান্না থামাতে পারছে না। নিজের 'হাস্যকর' দয়া, শিশুটির ক্ষুধা, ক্লান্তি ও ঘুম, এ এক অকল্পনীয় অভিজ্ঞতা ওর কাছে।

আমাদের চিন্তার ও অভিজ্ঞতার অসুখগুলোই আমাদের ভয়, বিশ্বাস, ইতিহাস এবং সভ্যতা। কতো নিরর্থক আমাদের সুখ! কোনো শিক্ষাই শেষ পর্যন্ত দেয় না।

পুরনো দিল্লীতে উঠলাম যে হোটেলে তার একখানা খুপরি-কুঠুরির ভাড়া দিনে পঁচিশ টাকা। ইণ্টার ন্যাশনাল স্টুডেন্টস কার্ড ছিলো বলে কলকাতা থেকে অমৃতসর পর্যন্ত থ্রু টিকিটের ভাড়া লেগেছে মাত্র চল্লিশ টাকা। এই স্টুডেন্ট কার্ডের ব্যাপারটা খুব ইণ্টারেস্টিং। যে কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকলেই, সেই প্রতিষ্ঠানের চিঠি দেখিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে পনেরো টাকা দিয়ে ইণ্টারন্যালনাল স্টুডেন্টস কার্ড পাওয়া যায়। নেহাত শুভ্র-কেশ না হলে প্রায় মধ্য বয়স্ক শিক্ষকরাও পেতে পারেন। আসলে প্রধান পরিচয় হলো যৌবন এবং সত্যিকারের ভ্রমণনিষ্ঠা। আসবার সময় তুরস্কের ট্রেনের কণ্ডাক্টরকে বেলজিয়ান এক যুবক তার ছোটো নোট বই-এর মতো পাশপোর্টকেই স্টুডেন্ট কার্ড বলে বিশ্বাস করায়। বলাই বাহুল্য, এই কার্ডের ফলে ভাড়ায় বেশ বড়ো রকমের একটা কনসেশন পাওয়া যায়, অর্ধেকের একটু কম। জাল পরিচয়পত্র দেখিয়েও কেউ কেউ এই ব্যবস্থার সুবিধে নেয়। এক হাঙ্গেরীয়ান ব্যবসায়ীকে এই কার্ড নিয়ে ঘুরতে দেখেছি, ভদ্রলোক তার ছেলের

কার্ড ব্যবহার করছিলেন। একটা জিনিস মনে রাখার দরকার, ট্রেন-ভাড়া এবং মিউজিয়ম ইত্যাদি প্রবেশপত্রের দাম ছাড়া আর কোথাও এই কনসেশন পাওয়া যায় না।

দিল্লীতে দুদিন থাকতে হলো আফগানিস্তানের রিটার্ন ভিসা অথরাইজ করানো আর অমৃতসর-কাবুল ফ্লাইট আরিয়ানা থেকে কনফার্ম করার জন্য। পরের দিন সকালে কনট প্লেসে আরিয়ানার কাজ সেরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ভিসাও পাকা, হঠাৎ দেখি ডেভিড অ্যামেরিকান এক্সপ্রেসের সামনে সিঁড়িতে বসে। সুদর্শন, লাজুক এই ওলন্দাজ যুবক রাজস্থানী নারী শ্রমিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, প্রায়ই ছুটি-ছাটায় এ দেশে এসে তথ্য সংগ্রহ করে। আমাদের দেখেই ডেভিড হো হো করে হাসতে লাগলো। 'এতো হাসির কী হলো। তুমি এখনও কী করছো এ দেশে? তোমার তো সপ্তাহ দুয়েক আগেই ফিরে যাবার কথা।' ডেভিড সত্যিই পথে বসে গেছে। আধ ঘণ্টা আগে ওর দামী মিনল্টা ক্যামেরা কিছু মূল্যবান নোটস আর আরো কিছু কাগজপত্র সহ ওর কাঁধের ব্যাগ ধূমকেতুর মতো এসে একটা লোক ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই বদমাশ উধাও। এরকম অবস্থায় প্রচণ্ড না হেসে উপায় কী বলো! ডেভিডের সঙ্গে তেহরানে আলাপ ইয়ুথ হস্টেল খুঁজতে খুঁজতে। একসঙ্গে একটা বড়ো দল জমিয়ে আফগানিস্তানের হীরাট পর্যন্ত এসেছি।

ডেভিডের সহ্যশক্তি ও বিনয় আমাদের মধ্যে কিম্বদন্তী হয়ে উঠেছিল। তারপর ও উত্তরে মজর-ই-শরীফে কালো তাঁবুর আদিবাসী ডাকাতদের সঙ্গে কিছুদিন থাকবে বলে চলে যায়, আমরা কান্দাহারের বাস ধরি। 'দেখ তোমার নসীব, ডাকাতদের ওখানে কিছু হলো না,

হলো কিনা এই আধুনিক কনট সার্কাসে।' আবার আমাদের পেট-ফাটা হাসি।

ঝামেলা হলেই আমরা ওকেই এগিয়ে দিয়েছি। কেবল 'ডাচ ট্রিটমেণ্ট' নিয়ে খোঁচা দিলেই ও একটু চটে যায় আর সেটা বোঝা যায় ওর হঠাৎ গম্ভীর মুখ দেখে। কথা হলো তিন/চার দিন পর ও কাবুলে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। জর্জ আর জেনেভিয়েভের সঙ্গেও কাবুলে দেখা হবে। ওরা পাকিস্তান হয়ে পৌঁছে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমরা যেন হিন্দুকুশ হোটেলে উঠি, নয়তো জালালাবাদ-এ। দিল্লি-পুলিশ বলেছে ওর ক্যামেরাটা উদ্ধার করে দেবে। কিন্তু বেচারার তথ্য-গিজগিজ করা নোটগুলো। একজন বিদেশীর নিবিষ্ট পরিশ্রমের ফসল, তা-ও আবার আমাদেরই দেশের অবহেলিত নারী শ্রমিক বিষয়ে। পৃথিবীর কোনো পুলিশই কি অনুসন্ধিৎসু পরিশ্রমী পর্যবেক্ষকের বন্ধু ও সহায়ক?

অমৃতসর মেলে উঠেই আরো অনেক পরিচিত বিদেশী ছেলেমেয়ের দেখা পেলাম। এরা, ডেভিডের মতোই, আসার সময় কোনো না কোনো দেশের অনেকটা পথ আমাদের সঙ্গে ভ্রমণ করেছে, একই হোটেলে থেকেছে বা একসঙ্গে প্ল্যান করে নানা জায়গায় ঘোরা হয়েছে। কারো সঙ্গে হয়তো গত গ্রীষ্মে ইউরোপের হাইওয়েগুলোতে হিচহাইক করতে গিয়ে আলাপ হয়েছে, এবারের গ্রীষ্মে তারা চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করেছে। আরও অনেকের সঙ্গে দেখা হবে কাবুলে। এ এক বিচিত্র সখ্য যা আঁকড়ে ধরে না কিন্তু অন্য ধরনের ছাপ রেখে যায়। দীর্ঘ পথযাত্রীদের একটা নিজস্ব ভাষা আছে সে তারা দল বেঁধেই ঘুরুক বা একা একা আলাদাভাবেই ঘুরুক। সেই ভাষাতেই

শুভেচ্ছাবিনিময় চলে, নানা প্রয়োজনীয় খবরের আদান-প্রদান ঘটে, ভালো সস্তার হোটেল কোথায়, সিরিয়া যাবার সর্টকাট রুট কোনটা, দরবেশদের আখড়ায় কখন যাওয়া যায়, হাজার রকমের পথ-চলতি বিষয়। সবই কেমন যেন এক আদি ও অকৃত্রিম সহযোগিতার ভাষায় প্রকাশ পেয়ে যায়। অথচ কোথাও তেমন গায়েপড়া ভাব নেই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রাইভেসীকে সম্মান করে চলে। এদের সঙ্গে যারা ভ্রমণ না করেছে তারা এদের গুণগুলো কোনো দিন ভালো করে জানবে না। কিছু অসভ্যতা দেখেছি নিশ্চয়ই কিন্তু সহনশীল সত্যি-কারের খোলা মনের অহংমুক্ত যৌবনকেই বেশি করে দেখেছি এই সব তরুণতরুণীদের মধ্যে।

প্রসঙ্গত, যে-নামে ঢালাও ভাবে এই সদা ভ্রাম্যমান চন্দ্রহাসের দলকে চিহ্নিত করা হয় সংবাদ-মাধ্যমের কল্যাণে, সেই 'হিপি' সংজ্ঞাটির উৎস জানাই একটু। বিশেষত, কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের ব্লুজ বা জ্যাজশিল্পীদের মধ্যে ব্যবহৃত 'হিপি' শব্দটি থেকে এর উৎপত্তি। এর অর্থ সমজদার বা যে ঠিক কেন্দ্রে রয়েছে, ঠিক সুরের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। অর্থাৎ যে বিচ্ছিন্ন বা দিশেহারা নয়, মেজাজী, দিলদার, বস্তুমুগ্ধ মানুষ। বর্তমান সভ্যতা, কাল্ট অব ইন্টালিজেন্স বা বুদ্ধি কসরতীর বিরুদ্ধে একে হৃদয়ের অভিনব জাগরণ বলা যায়। এরা আলালের ঘরে দুলাল বা জেট সেটারস নয়, বরং মুসাফির, হ্বাণ্ডার ফৌগেল বা উড়ো পাখিদের লোকায়ত জিজ্ঞাসাই এদের পরিচয়। উৎকণ্ঠিত শতাব্দীর দ্বিতীয় জিপসি এরা।

অমৃতসরে এসে একটু ঝরঝরে লাগছে নিজেকে। পাঞ্জাবে এলেই ভারত-আফগান মেজাজের দৃঢ় উদাসীন লোক-দর্শন গায়ে এসে লাগে।

বেরাদরী-সভ্যতার জন্য মন প্রস্তুত হয়ে যায়। বস্তু এবং একাকীত্বই যেন এই জীবন দর্শনের কেন্দ্র। নারীও আছে পটভূমিকায়, সাহচর্যে, রূপমমতায়। প্রত্যক্ষ শুধু ধরিত্রী, আকাশ ও জীবনের কঠোর বীরত্ব। গৌরবের দুর্ভার স্মৃতি-আনুগত্য ও গৌরবহীনতার চিরন্তন শৈশব। এখান থেকেই শুরু হোলো যুদ্ধ ও শান্তি প্রেম ও বৈরাগ্যের এখনও অনাবিষ্কৃত এক স্বতন্ত্র মানুষ-ছুঁয়ে-থাকা ভবিষ্যৎ। এর উদ্দাম মানবিক অন্তঃস্রোত আর কঠিন সামন্ত-প্রচ্ছদ এখনও আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ও জটিল।

স্বর্ণমন্দিরের অতিথিশালা বা গুরদোয়ারে একটা আলাদা ঘর ও মাঝারি সাইজের খাটিয়া পাওয়া গেল। ঘরভাড়া নেই, স্বর্ণমন্দিরের নামমাত্র প্রণামী এক টাকা। কর্মীদের প্রত্যেককেই শান্ত ও কর্মনিষ্ঠ জীবনে অভ্যস্ত বলে মনে হোলো। মাঝখানের বিশাল চত্বরে স্নানের জায়গা, মেয়েদের ও ছেলেদের জন্য দুভাগে ঘেরা, ও অসংখ্য কলে অজস্র জল। সারা প্রাচ্যেই ধর্মস্থানগুলির পাশে অপর্যাপ্ত জলের ভূমিকা আমার কাছে আশ্চর্য লাগে। বিশেষ করে আরো পশ্চিমে অতিকায় মসজিদগুলিতেও এই ব্যবস্থা দেখেছি সর্বত্র। ধূলি-পাথর ফাটা হৃদয়-প্রান্তরে এই জল তো আরো শান্তিময়। ঈশ্বরউপাসনার স্থানগুলিই তো এদের মরুদ্যান, এই তো এদের লোকসভা! প্রাণ ভরে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা গেল কিছুক্ষণ। কাবুলে আবার কোথায় ভালোভাবে স্নান করা যাবে কে জানে। সেই পারস্যে পৌঁছে খুশিমতো জল পাওয়া যাবে। আফগানিস্তান বড়ই খরাগা অন্তত সস্তার হোটেলগুলোতে কোনো জল নেই। স্নান সেরে, খালসা হোটেলে খাস পাঞ্জাবী তড়কা খেয়ে স্বর্ণমন্দিরে ঢোকা গেল। অকল্পনীয় পরিচ্ছন্নতা।

নিশ্চয়ই কোনো উৎসব চলছিলো, প্রচণ্ড ভিড় না হলেও যথেষ্ট লোক, ইতস্তত সামিয়ানা, প্রায় প্রতি দশজনের জন্য আবাল বৃদ্ধ ভলান্টিয়াররা বাদশাহী হাত পাখা ঘুরিয়ে চলেছে। ঝালর দেওয়া বর্ডার সহ সুদৃশ্য ও নাটকীয় সেইসব পাখা। ভারতের যে-কোনো হিন্দু মন্দিরের সঙ্গে এই পরিবেশের পার্থক্য স্পষ্ট। এখানে চারপাশে ভিখিরি অন্ধকার ও অর্থগৃধ্নু পাণ্ডাদের ভিড় নেই। গম্বুজের সোনা নিশ্চয়ই অর্থগৌরব জানায় কিন্তু তার কোনো উৎকট প্রকাশ নেই মাটির কাছাকাছি। সকলেই অত্যন্ত সাধারণ পোশাকে এসেছেন, মধ্যবিত্ত তীর্থযাত্রীদের সংখ্যাই বেশি। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ শুনতে পেলাম মাইক্রোফোনে ভজন গাওয়া হচ্ছে। একদল ভক্ত মানুষের গলার মতোই স্বাভাবিক ও আটপৌরে সেই ঐকতানভজন। একটা ছোটোখাটো পুকুরের মধ্যে গ্রন্থসাহেবের মন্দির। সরু পথ জলের ওপর দিয়ে গিয়ে মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সেখানে, ভেতরের উপাসনা গৃহে দশাসই চেহারার শিখ নারী পুরুষ একান্ত নিবেদিত চিত্তে ভজন গেয়ে চলেছেন, কেউ কেউ অঝোরে কাঁদছেনও। শিখ ধর্মের এই মরমী মিষ্টত্বের পরিচয় এমনভাবে আগে কখনও পাইনি।

আমাদের দেশের বিভিন্ন ধর্মের প্রতিদিনকার আচার অনুষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আমরা কী নির্মমভাবে অজ্ঞ। বই পড়ে তাদের সম্পর্কে একটা কাজ চালানো গোছের সংজ্ঞাগত ধারণা হয়তো শিক্ষিত মহলে থাকে কিন্তু সহস্র আচার অনুষ্ঠানের আড়ালে যে অবিনষ্ট মানব সত্য লুকিয়ে আছে তার কতোটুকু খবর আমরা রাখি। ধর্ম নিরপেক্ষতা কি ধীরে ধীরে আমাদের ধর্ম-উদাসীন করে তুলছে? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মন্দির, মসজিদ ও গির্জা প্রাসাদগুলি দেখে বারবার যে কথা মনে হয়েছে তা হল

এই যে, ধর্মের আফিংআচ্ছন্নতা থেকে সেদিনই আমরা মুক্ত হতে পারবো যেদিন সর্বতোভাবে আবিষ্কার করবো মানুষের প্রতি ধর্মের গোপন ইন্দ্রিয়-সম্পৃক্ত আনুগত্য। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির সেই উপলব্ধিরই একটি ধাপ। শহরে অজস্র সাইকেল, সবাই ব্যস্ত এবং মোটামুটি প্রসন্নচিত্ত। সৌজন্য ও কর্মপ্রেরণায় গর্বিত এই শহরের অধিবাসীরা আমারই দেশের লোক ভেবে কেমন যেন খুশি হলাম। কাল দেশ ছাড়বো। এই মুহূর্তে অগ্রগামী পাঞ্জাবের উন্নতি দেখে মনের মধ্যে এক ধরনের আত্মগ্লানিও যে উঁকি মারছে না তা নয়, বহুবারের মতো আরেকবার জানলাম, আমি শুধু বিদ্যাদিগগজ বাঙালী নই, অসহায় বিত্তহীন ভঙ্গুর বিভ্রান্ত বাঙালীও বটে।

বিদেশীদের অনেকেই পাকিস্তানের পথে রওনা দিয়েছে দিল্লী থেকে। তারা দিল্লী-ফিরোজপুর-লাহোর-পেশোয়ার-কাবুল এই ভাবে যাবে। তাতে এদের ভাড়া লাগবে সবশুদ্ধ ৫০ টাকার কাছাকাছি, দূরত্ব এগারোশো কিলোমিটার প্রায়, সময় লাগবে ট্রেনে এবং বাসে দিন তিনেক।

দিল্লি থেকে প্রত্যেকদিন রাত্রে ফিরোজপুরের ট্রেন ছাড়ে, পরদিন ভোরে পৌঁছয়। সেখান থেকে বাসে সীমান্ত পেরিয়ে লাহোর ৬ ঘণ্টায়। লাহোর থেকে পেশোয়ারের ট্রেন প্রত্যেক সন্ধ্যায়, ১২ ঘণ্টার পথ। পেশোয়ার থেকে দেবাদিদেব হিমালয়ের পার্বত্য আখড়াগুলি ঘুরে বাসে ১০ ঘণ্টায় কাবুল। আমাদের আসার সময় কথা হচ্ছিল ভারতীয়দের জন্য সীমান্ত খুলে যাবে। কিন্তু সে যখন হল না তখন অগত্যা প্লেনেই কাবুল যাওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই। এই প্লেন ভাড়াতেই খরচ পড়লো সাড়ে তিনশো টাকার মতো। আসা-

যাওয়ায় নিরর্থক সাতশো টাকার ধাক্কা। অথচ সীমান্ত খোলা থাকলে একশো টাকাতেই এই অংশের যাতায়াত সারতাম। কী আর করা।

আরো একটা রুট আছে স্থলপথের। আফগানিস্তান এড়িয়ে, পুরো দক্ষিণ পাকিস্তানের রেলপথ ধরে কোয়েটা হয়ে সরাসরি ইরান-সীমান্তে চলে যাওয়া, তারপর সীমান্তটুকু বাসে পেরিয়ে ইরানের জাহিদান থেকে আবার ট্রেন ধরে তেহরান পৌঁছোনো। এই রুটেরই উন্নতি সাধন চলছে এখন। কিন্তু প্রাচ্যপ্রিয় বিদেশী যাত্রীরা এই রুট খুব একটা পছন্দ করে না, একমাত্র অ্যাডভেঞ্চারলোভী কেউ কেউ ছাড়া। যে-কোনো কারণেই হোক বালুচিস্তান যথেষ্ট নিরাপদ বলে কেউ মনে করছে না। খুনখারাপি এবং নারী হরণের গুজব শোনা যাচ্ছে। মেয়েরা তো ওদিকে যাচ্ছেই না। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে যারা ইচ্ছুক এবং একা, তাদের পুরুষ সহযাত্রী বা ট্র্যাভেলিং পার্টনারও পাওয়া যাচ্ছে না। ওরই মধ্যে একজন মধ্যবয়স্ক ক্যানা-ডিয়ান ডাক্তার রবার্ট ডীন, যিনি স্যাবাটিকাল লীভ নিয়ে পৃথিবী ঘুরছেন, একটা ছোট্টো দোনামনা দলকে সাহস দিয়ে তার নেতা হিসেবে যেতে রাজী হয়ে গেলেন। সেই দলে চারটি ছেলে আর সাতটি মেয়ে, বব (ডাক্তার) ছাড়া। মেয়েরা, বিশেষত বাড়তি তিনটি মেয়ে ঠাট্টা করতে লাগলো আমরা দুজন না হয় তোমার দুপাশে থাকবো কিন্তু বাকি একজন। বব তাদের মধ্যে খাণ্ডার গোছের দেখতে মিরাণ্ডাকে দেখিয়ে বললেন, 'ও থাকবে আমার সামনে'। ট্র্যাভেলিং পার্টনার বা সহযাত্রীরা একটি অলিখিত বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে। তারা সব অর্থেই সহযাত্রী-সহযোগী। ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিবিড় হবে

িক হবে না সেটা কঠিনভাবে পারস্পরিক ইচ্ছার অধীন। খুব কম ক্ষেত্রেই এই পথ জীবনের কার্যকরী অভ্যাসটিকে মলিন হতে দেখেছি। দীর্ঘ পথযাত্রায় নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব নিয়ে বহির্জগতের অনেককে অশোভন ইঙ্গিত করতে শুনেছি (ইদানীং অসংখ্য পচা বাজার-কাটতি উপন্যাস এধরনের ইঙ্গিতে বর্ণনায় ভুরভুর করে) কিন্তু তারা যদি জানতেন কতো অবরোধের ক্ষত এই ধরনের বন্ধুত্ব সারিয়ে দেয়। যাই হোক, দিল্লিতে আমরা ঘটা করে বব-বালুচিস্তান দলটিকে বিদায় দিয়েছিলাম। পরে কাবুলে পৌঁছে ওদের একজনের চিঠিতে জানতে পারি ছোটোখাটো একটি বিপদ কাটিয়ে ওরা নির্বিঘ্নেই তেহরান পৌঁছেছে। বিপদ কী? না পথে কেবল মিরাণ্ডা রেপড হয়। সীমান্তে বাস না পাওয়ায় ওরা ট্যাক্সি ভাড়া করে। ছোটো এক ডাকাতের দল সারিবদ্ধ বন্দুক হাতে ট্যাক্সি থামিয়ে শান্তভাবে অন্যদের হাত বেঁধে মিরাণ্ডাকে ধর্ষণ করে। দলটি সশস্ত্র থাকায় কোনো ধস্তাধস্তিরও সুযোগ ঘটেনি। মিরাণ্ডা তেহরানে এক নার্সিং হোম-এ আছে, দিন দুয়েকের জন্য ওর সাময়িক নার্ভাস ব্রেক ডাউন এর চিকিৎসা হবে। বব একা সোজা কুর্দিস্তানের দিকে রওনা হয়েছে। এরকম বেশ কিছু লোক দেখেছি যারা জাত অ্যাডভেঞ্চারার কিন্তু প্রকৃতির চেয়ে মানুষের বৈচিত্র্যই যাদের বেশি করে টানে। আমি নিশ্চিত জানি ওই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার জন্য কিঞ্চিৎ বিপর্যস্ত বোধ করলেও বব-বালুচিস্তান দলটির কেউ কোনোদিন বালুচিদের নিন্দে করবে না। কেবল পরের বার ওই পথে যাবার সময় হয়তো আরো সতর্কভাবে ভ্রমণ করবে। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে ডাকাতরা সাতটি মেয়ের মধ্যে মিরাণ্ডাকেই কেন বেছে নিলো। ওই সবচেয়ে ওয়েলবিল্ট

বলে কি ? এ প্রসঙ্গে মিরাণ্ডার অনুমান ও পরে আমাদের লিখেছিলো, যা আরো বিস্তৃত আকারে ক্যানাডার মনস্তত্ত্ব বিষয়ক একটি পত্রিকায় বেরিয়েছে। সংক্ষেপে ওর ধারণা : আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগের দরুন দুর্দমনীয় উপজাতিরা এই অঞ্চলে তাদের রাষ্ট্রশক্তিকে বিশ্বের কাছে অপদস্থ করার জন্য মাঝে মাঝেই এই ধরনের ঘটনার আশ্রয় নেয়। এর পেছনে এদের রাজনৈতিক নীতিবোধই বেশি সক্রিয়। সুতরাং প্রতীক ধর্ষণ হিসাবে এরা একজনকেই বাছে এবং তাও শারীরিক দিক থেকে শক্তিশালী কাউকে যাতে তার ওপর মানসিক বিভীষিকার আঘাতটা একটু কম হয়। অবাক হয়েছিলাম মিরাণ্ডার এই বোধশক্তি দেখে, তা সে ভুল বা ঠিক যা-ই হোক না কেন।

অমৃতসর এয়ারপোর্টে প্রচণ্ড তুলকালাম। ছোট্টো টার্মিনাল, তারই মধ্যে চারজন লোক তিনশো ঘড়ি পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। প্লেন ছাড়তে দেরী হচ্ছে, আমাদের এখনও কাস্টমস-এ ডাকছে না। চারিদিকে চেঁচামেচি। সময় কাটাবার জন্য এবং গণ্ডগোল থেকে মন সরাবার জন্য নানা গল্পগুজব চলছে। তিনজন শিখ কাস্টমস অফিসারের মধ্যে একজন আমাদের আড্ডায় শ্রোতা। তখনই অনবদ্য এক ব্যঙ্গ-গল্প শুনেছিলাম যেটা পরে ইওরোপের অন্যত্রও শুনেছি, ছাপাও হয়েছে হয়তো নানা জায়গায়।

গল্পটা এই : চেকোশ্লোভাকিয়ায় একটি লোকের ঘড়ি মাতাল অবস্থায় একজন সৈন্য কেড়ে নেয়। লোকটি অগত্যা থানায় গিয়ে কাঁচুমাঁচু হয়ে অফিসারকে বলে 'স্যার আমার রাশান ঘড়িটা এক সুইস সোলজার জোর-জুলুম করে কেড়ে নিয়েছে। আমি তাই অভিযোগ জানাতে এসেছি।' অফিসার ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন : 'কী, কী

বললে ?' লোকটি আরো ভয়ে ভয়ে একই কথা বলে। অফিসার রেগে গিয়ে : 'মানে, তুমি কি বলতে চাও যে তোমার সুইস ঘড়িটা একজন রাশান সোলজার অন্যায়ভাবে কেড়ে নিয়েছে।' লোকটি বিবর্ণ বলে ওঠে 'আমি বলিনি স্যার, আমি বলিনি, আপনিই বলেছেন একথা।' গম্ভীর গালপাট্টা দাড়ির কাস্টমস অফিসারও হেসে উঠলেন। তারপর বললেন 'ইন্সিডেন্টলি এই ঘড়িগুলোও রাশান এবং এগুলো প্রথমে রাশিয়া থেকে পাচার হয়ে আফানিস্তানে এসেছে। সেখানে তেমন সুবিধে না হওয়ায় ভারতের বাজারে এসেছিলো। বিক্রি হয়নি তা আবার একই পথে ফিরে যাচ্ছে।' আমাদের মধ্যে একজন : 'ওয়েল হোয়াট অ্যাবাউট আওয়ার ওন টাইম, আর উই গে রিং টু গো ?' আবার একচোট হাসি। হ্যাঁ এবারে আমরা যাবো। বিশেষ তল্লাশি হল না আর। প্লেন ছাড়লো ঠিক তখনই সূর্য যখন ট্র্যাফিক-সিগনালের ইতস্তত করা হলুদ বৃত্ত একখানি। এবার সত্যিই দেশের মাটি ছাড়লাম। নিজের রোগা হাতে অমৃতসরে কেনা পুরু ইস্পাতের কাড়া অনুভব করতে ভালোই লাগছে। আট-দশজন দীর্ঘকায় শিখ অফিসার নীচে দাঁড়িয়ে। ক্যারল ছুটে এসে জানলা দিয়ে সেই অফিসারকে দেখলো যিনি নিখুঁত ভাবেই বডি সার্চ করছিলেন বলে মেয়েমহলে একটু মজার সৃষ্টি হয়েছিলো। মহিলাটি এখন হাত নেড়ে, ঈষৎ হেসে বিদায় দিচ্ছেন। আমি সামনের সীটের সিন্ধি-তরুণীর সঙ্গে গল্প জমালাম। ওমা, এরই মধ্যে প্লেন নামতে শুরু করেছে। লাহোর, এও তো আমারই দেশ। নেমে রাহাদ-এর সঙ্গে একদিন গল্প করে গেলে কেমন হয় ও এখানে একটা কলেজে পড়ায়, গ্রীসে আমার সহকর্মী ছিলো দুবছর। নতুন বিয়ে করেছে রাহাদ, উন্মাদ-শিশুর

মতো পাঠান এই রাহাদ কী খুশিই না হোতো আমরা গেলে, কতো তর্ক-উত্তেজনা আমরা একসঙ্গে ছেনেছি। হায় বৃহত্তর ভারতের মানুষ ও তার ভালোবাসা। প্লেন নামলো, কিছু প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। স্তম্ভ, পরিখা, আধ-ভাঙা প্রাসাদ ইত্যাদি, হয়তো কোনো গ্রীক বা তুঘলকী কীর্তি। সত্যি সত্যি লাহোরের মাটিতেই দাঁড়ালো এসে প্লেন। সিন্ধি-তরুণীটি জানালার পাশে ছটফট করছে 'জামাল, হুঁই জামাল', আরো কী সব বুঝলাম না। জানলায় ঠকঠক করলো কিছুক্ষণ। মেয়েটির বাবা ওর পাশের খালি সীটে এসে বসলেন। বর্ষীয়ান অভিজাত পুরুষ, আমাকে আলাপের পর বললেন, 'ছাটস হার বয়ফ্রেণ্ড, স্টাডিজ আরকিটেকচার হিয়ার। হ্যাজ আণ্ড টোল্ড ইয়ু ছাট শী ওয়েন্ট টু সী মাই ব্রাদার ইন ইনডিয় ? হি ইজ এ ফিলজফার গুড ম্যান। উই লিভ ইন ইরান, আই অ্যাম ডুইং মাই স্টাডিজ ইন পারশিয়ান, অ্যাণ্ড সো ইজ শি।' অকারণেই মনে পড়লো বাপ ঠাকুর্দাদের কেউ কেউ ফারসি জানতো এখনও কেউ কেউ জানে। মনে পড়লো আমার এক মাসীমার বিয়ে হয়েছিলো এক মিলিটারির ডাক্তারের সঙ্গে উনি এদিকটায় খুব ঘুরেছেন স্বামীর সঙ্গে, ওঁর খুব ইচ্ছে ছিলো ফারসি শেখার। আর বারবারই মনে পড়লো একজনকে, তিনি হলেন বাঙলা ভাষায় ফারসি মেজাজের একমাত্র জমাট বক্তৃতা, সৈয়াদ মুজতবা আলি। সারাটা পথ অধ্যাপক ও তাঁর কন্যার সঙ্গে গল্প করতে করতে গেলাম। মাঝে মাঝেই নীচে তাকালে দেখা যায় রুক্ষ লাল রঙের পর্বতশ্রেণী, নানা পথ, পথরেখা, সবুজ বুঝি চোখেই পড়ে না। চারদিক যেন ঝলসে যাচ্ছে। এই সেই দস্যুতা ও মিত্রতার পথ। আর দশ মিনিট পরেই আমরা কাবুলে

নামবো।

'আমি যেমন খোঁড়া নই, পৃথিবীটাও তেমনি ছোট্টো-খাট্টো নয়,' এই অপূর্ব ফারসি প্রবাদটি অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়ে পড়ে কাবুলে এলে। হুমায়ুন-বাবরের কাবুলে। রেশম পথের বেশ কিছু রঙীন সুতো চারদিক থেকে এসে আলগাভাবে জট পাকিয়ে যায় মধ্য-এশিয়ার প্রবেশদ্বার এই রোমাঞ্চকর শহরটিতে। প্রথম দিন কিছুই মনে হয় না, যে-কোনো উত্তর ভারতীয় শহরেরই মতো ঈষৎ মোগলাই চেহারা। দ্বিতীয় দিন থেকেই কঠোর বাস্তব-ক্ষুব্ধ মধ্য-এশিয়া চোখের সামনে হুড়মুড় করে দাঁড়ায়। দুর্বোধ্য মোঙ্গল, সৌখীন পারস্থ, নিয়তি-তাড়িত পাখতুন, কট্টর তুর্কী আর দুর্মদ যাযাবর সংঘের ভিড়ে নিজেকে নিতান্তই বেচারী বাঙালী বলে মনে হয়। মানব-জাতির বিচিত্র সমন্বয় এতো অতর্কিতভাবে ঘিরে ধরে যে বেশ খানিকটা ভয়ই করে। শুধুমাত্র ভাষা ও আচার ব্যবহারের দূরত্ব নয় বরং স্মৃতিগত অনুষঙ্গে তাকে কিঞ্চিৎ পরিচিতই মনে হয়। সেই অস্পষ্ট পরিচয় যখন সভ্যতার অপরিচয় ও জটিল জীবনচর্যার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে তখনই ঘটতে থাকে একটা চ্যালেঞ্জ। স্পর্শশীল আগন্তুকের কাছে তার ভার কম নয়। বাজারে যাই আর এইসব দুরন্ত মানুষের প্রতিদিনকার ব্যবহারের দ্রব্য-সামগ্রী দেখি।

এরই মধ্যে ফুটে ওঠে তার ক্রোধ ও নম্রতা সব মিলিয়ে একটা স্পর্শসহ ছবি। জট খুলে যায়। আরো অন্তরঙ্গভাবে ধরা পড়ে আফগান পরিহাস সারল্য ও ধৈর্য।

পুরোনো বন্ধু সাদউদ্দীন শপুন-কে ফোন করতেই সে চ্যাঁচাতে লাগলো "গুল মহম্মদের বাড়িতে এক্ষুনি চলে এসো তোমাদের মারবো।

সদ্য-বিবাহিত বন্ধুদের ঠ্যাঙাতে আমার কী যে আনন্দ তা-তো জানোই, আর বিশেষ করে যাদের স্পর্ধা হয় কাবুলে এসে হোটেল থেকে ফোন করার।” নিখাদ অসংস্কৃত ব্যবহার। খটকা লাগলো নিজের বাড়িতে না থেকে গুল মহম্মদের বাড়িতে ডাকলো বলে। সাদ পাখতুন কবি, পশতু একাডেমির তরুণ কর্মকর্তা। আমেরিকার আয়োয়া সিটি নামে ছোট্ট একটি ক্যাম্পাস-টাউন আমরা দুই বাদামী ভূত এক বছর ধরে কাঁপিয়ে রেখেছিলাম। আড্ডার তর্ক ও নকল হাতাহাতির মধ্যে ওর ঢোলা আফগান পোশাকের প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে পাজামা-পাঞ্জাবী দুটোই খুলে সাদ আমাকে দিয়ে দিলো। আমিও গম্ভীরসে নিয়ে নিলাম দেখে ক্যারল রীতিমতো হতচকিত আর গুল মহম্মদকে দেখি মুচকে মুচকে হাসছে। সাদ খিস্তি শুরু করেছে 'শালা ভেতো বাঙালী হলে কি হবে জামা-কাপড় শুদ্ধ কেড়ে নিয়ে চলে যায়। এই তো পুরনো বন্ধুর নমুনা! তারপর ক্যারলকে 'আমরা অভিন্ন হৃদয় যেখানেই থাকি না কেন। উই লঞ্চড এ ওয়ার এগেনস্ট 'মেথডলজি' টুগেদার, দেয়ার। ডু ইয়ু নো দি বাফুন কলড মেথডলজি।' আবার হাসি। ক্যারল জিজ্ঞেস করে সেই যুদ্ধের ফল কি? সাদের উত্তর 'অবশ্যই আমরা জিতেছি। দেখছো না আমাদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।' এতোক্ষণে ওর চোখে জল হয়তো একবিন্দু। গুল মহম্মদ আমাকে কিছুক্ষণ আগেই অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে জানিয়েছে যে তিনদিন আগে সাদের দাদা রফিককে পাখতুন-বিরোধী একটি ছেলে একসঙ্গে কফি খেতে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বাড়ির বাইরে ডেকে পিস্তলের তর্জনীতে মুছে দিয়েছে। আমরা উঠেছি কাবুলের পথিক-পাড়া শহরনও-এর হিন্দুকুশ হোটেলে। ফিরলাম রাত তিনটেয়। একবারও

শুর দাদার কথা উচ্চারণ করিনি, পাখতুন-কে কেউ সান্ত্বনা দেয় না। এই সেদিনই সাদের চিঠি এলো: কোনো খবর নেই কেন? হতভাগা হিন্দু পুনর্জন্মে বিশ্বাস করো বলে কি বিধর্মী বেরাদর, বেঁচে আছে কি মরে গেছে তারও খোঁজ করবে না!' হোটেলের দরজায় হাত রেখে মাথা নিচু করে সাদ বলেছিলো, 'দীপক, আমরা এশিয়ানরা কবে দিনকে দিন আর রাতকে রাত বলে দেখতে শিখবো?' "উই আর কনডেমড টু ড্রীম।"

রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা পৃথিবীর বিশালতম শান্ত সমাহিত বামিয়ান বুদ্ধ। এককালে এখানে ছিল একাধিক লোক-নিবিষ্ট সংঘারাম। এই পর্বত গাত্রের অমর্ত্য বুদ্ধমূর্তি ছাড়া তার আর কোনো চিহ্ন নেই আজ। তবু কেন জানি না মনে হয় নির্মম সামন্ত প্রচ্ছদের আড়ালে যে-আফগান-মানব দাঁড়িয়ে রয়েছে তার অন্তর্নিহিত শক্তি কখনোই সেই প্রশান্তি-ঐতিহ্য হারাবে না। কাবুল থেকে বাসে বামিয়ান উপত্যকায় আসতে সময় লাগলো বারো ঘণ্টা, ভাড়া দশ টাকা। এরই অল্প দূরে অবিশ্বাস্য এক নীল হ্রদ, বন্দ-এ-আমীর। পাহাড়ের চুড়োয় বসে থাকা স্থির পরিস্বচ্ছ এক আকাশের প্রতিবিম্ব। মৃত আগ্নেয়গিরির গুহামুখ ভরাট করা অথৈ সবুজ-নীল জল। চারপাশ ঘিরে বৃত্তের ভঙ্গিতে আঁকাবাঁকা কানা উঁচু বাটির দেয়াল। কুশান বৌদ্ধরা কি এঁরই দর্পনে দুঃখের উৎস-কে দেখতো?

কাবুলে ফিরে গিয়ে আক্ষরিক অর্থেই কয়েকটি রাজকীয় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হোলো। এঁরা সকলেই নানাভাবে রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত এবং সেই সুবাদে উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাও বটেন। আমাদের আরেক বন্ধু ওমর, এই ওমর সুলতান সত্যিই এক অ্যান্টি-সুলতান।

গ্রীসের সালোমিকায় পাঁচ বছর কতো হুল্লোড় আর মজাই না একসঙ্গে করেছি আমরা। খিচুড়ি রাঁধতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলা। গ্রীক সেনাপতিদের আসরে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাজাবার নাম করে তৎকালীন নিষিদ্ধ কম্পোজার থিওদোরাকিস-এর সুর শ্রোতাদের কানে চোরা-চালান করা, ভূমধ্যসাগরের তীরে কুচো অক্টোপাস ধরা—ইত্যাদি। সত্যিকারের দরদী পাঠককে জানাই যে ভবিষ্যতে আমার য়ুনানী-রোমাঞ্চ-প্রসঙ্গে কোনো লেখার মধ্যে তিনি সেই অমর ওমরকে পাবেন পথচলতি অনেক অবিস্মরণীয় বন্ধুর মতো যার সঙ্গে কোনো যোগাযোগই আর রাখা সম্ভব হয়নি আমার প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই। আপাতত রাজকীয় খানাপিনার জগতেই ফেরা যাক।

স্থলতানের আত্মীয়-সমাজ। কেউ ইটালিতে আফগান রাষ্ট্রদূত, কেউ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী, আর কেউ বা অন্য কোথাও আফগান দূতাবাসের প্রোটোকল অফিসার। ফারসি আভিজাত্য এঁদের এখন আর ততোটা নখদর্পণে নেই, তার ক্ষীণ রেশটুকুই লেগে আছে। প্রকৃত বৃদ্ধদের সত্যিই উজ্জ্বল লাগে, যেন মিনিয়েচার থেকে উঠে এসেছেন তাঁরা। কলকাতায় আমিনিয়া-সাবীর-এ মোরগ মসল্লাম খেয়ে মোগলাই খানার পাঠে যার হাতেখড়ি অর্থাৎ ভুল শিক্ষা, তার অবস্থা পাঠক কল্পনা করুন এই হাঁকডাকি খানদানী আফগান খানা-পিনার জমায়েতে। পৃথিবীর অধিকাংশ অভিজাত খাদ্য-সভাই বোধহয় এমন অশোভনভাবে অপচয়ধর্মী। সাধারণ আফগান-এর লাঞ্চ হোলো একখানা বিশাল হাতে গড়া নানরুটি আর গোটা ছয়েক নধরাকৃতি পেঁয়াজ। দু-এক টুকরো মাংস থাকলে তা রীতিমতো ভোজ তার কাছে। কখনো কখনো এই রুটি বিশাল দুহাত বেড়ের ঢালের

মতোও বড়ো হয়। সেটা ফ্যামিলি রুটি, সবাই ছিঁড়ে খায়। আমরাও তা-ই খেয়েছি ক্যারাভান-সরাইগুলিতে। সারা দেশের হাইওয়ে নেটওয়ার্ক জুড়ে ছড়ানো রয়েছে এই আদিম প্রতিষ্ঠান। মাইলের পর মাইল ধু-ধু মরু প্রান্তর পাহাড় পর্বত পেরিয়ে বাস, মোটরগাড়ি, উট, ঘোড়া বা খচ্চর ইত্যাদিতে চড়ে পথযাত্রীরা এখানে এসে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেয়। প্রশস্ত মেঝেয় গালিচা বিছানো। চোখে মুখে জল দিয়ে, খিদে পেলে রুটি পেঁয়াজ আর এক বোতল নোনতা ঘোল জাতীয় পানীয়। নইলে এক গেলাশ কড়া দুধ ছাড়া চা এক খণ্ড রুটি সহ। হ্যাজাক লণ্ঠনের মতো দেখতে রূপোলি সামোভার-এ সেই চায়ের লিকার গরম রাখা হয়। ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি নারগিলা বা গড়গড়াও দেখা যায় কোথাও কোথাও। গজনী আর কান্দাহারের মাঝামাঝি এই রকম ক্যারাভান-সরাইতেই আমাদের সঙ্গে আলাপ হয় আজেরবাইজানী ভূতত্ত্ববিদদ্বয়ের। রিটায়ার করে ভ্রমণ করছেন তাঁরা, শিশুর মতো সরল কিন্তু প্রজ্ঞায় অধীর মুখ কোনো এক দুর্জ্ঞেয় সঙ্গীতের তানবিস্তার।

সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান বাসের জানালা দিয়ে যাযাবরদের ভস্মপ্রায় ছাউনির ওপর সূর্যের সম্পর্কবিহীন সোনা ঝরে ঝরে পড়তে দেখেছি আর তার দশ মিনিট আগেই দেখেছি সারি সারি মৃত্তিকানত শির গুণগান করছে পরমেশ্বর আল্লার, বারবার নুয়ে পড়ে, হাত নেড়ে, স্বাগত জানাচ্ছে জীবন্ময় পৃথিবীর অধিকর্তাকে। কে সেই অধিকর্তা? এক বিচারহীন শাসক না সহযাত্রী বান্ধব? কোন আর্তি জেগে ওঠে ক্যাস্পিয়ান সাগর, কৃষ্ণ সাগর আর আরব সাগর তোলপাড় করা উন্মাদ আজানের স্বরে? কোন জ্ঞান ছুটে যায় আকাশ চেরা

রকেটের মতো মিনারেটগুলি থেকে ? কোন উর্ধ্বে ? কোন প্রেম স্তনিত হয় মসৃণ সোনালী গম্বুজে ? অকারণেই মনে পড়ে যায় অরুণ কুমার সরকারের কবিতার লাইন, 'পুরোনো বন্ধুরা সব স্মৃতির গম্বুজ হয়ে গেছে'। শুধু একটি বিশেষ মানুষের বন্ধু সম্পর্কে নয় মানব সভ্যতার বন্ধু সম্পর্কেও একথা সত্যি। এই সুযোগে দীর্ঘ স্থলপথের যাত্রীদের জন্য একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই, ধৃষ্টতা মনে হলে পাঠক নিজ গুণে ক্ষমা করে নেবেন। দৈনন্দিন সহজ জীবনযাত্রার স্পর্শ ছুঁয়ে ছুঁয়ে মানুষের শৈশব, যৌবন ও জরার বহু বিচিত্র প্রদেশ অতিক্রম করে এই পথিক যে-উপহার পাবেন তা হোলো এক অভূতপূর্ব জীবন্ময় দার্শনিকতা ও বস্তুনিষ্ঠা এবং বলাই বাহুল্য তা তার অস্তিত্বের ভিত পর্যন্ত নড়িয়ে দেবে। তাকে ধরে রাখতে গেলে ছাড়তে হবে অনেক আবরণ, ঘরে ফিরে এসে বরণও করতে হবে অনেক দুঃখ ও লাঞ্ছনা, কেননা তার অনুভূতির সঙ্গে আর তার পরিবেশের অনুভূতির কোনো মিলই ঘটবে না বিশেষ করে দ্বিতীয়টি যদি বৃহত্তর উদার মানব-সত্যের সঙ্গে অনেকটাই সম্পর্কচ্যুত হয়ে পড়ে। আত্মউপলব্ধির এই গোপন রত্নটিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য শুরু হয়ে যাবে দুই আমির মরণান্তিক টানাপোড়েন। এরই নাম জাগরণ-বিদ্ধ জীবন।

আমাদের হোটেলের বাথরুমটি কমন। সকালে একটু বেলা করেই উঠেছি। বাথরুমে গিয়ে দেখি বেসিনে মাথা রেখে লিণ্ডা, আমাদের ফ্লোরের কোণের ঘরের মেয়েটি, গোঙাচ্ছে এবং মনে হচ্ছে পড়ে যাচ্ছে, কিছু একটা ধরে থাকার চেষ্টা করছে। ছুটে গিয়ে ওকে ধরতেই দেখি বেসিনে একটা সিরিঞ্জ। আমাদের ঘরে আরও একজনের সাহায্যে এনে খাটে শুইয়ে দিতেই লিণ্ডা অচৈতন্য হয়ে পড়লো। ক্যারলের

কাছে ওকে রেখে আমরা কয়েকজন ডাক্তার ডাকতে ছুটলাম। লিণ্ডা যা করছিলো তাকে ড্রাগ-এ্যাডিক্ট বা নেশা-নির্ভরদের পরিভাষায় বলে 'ফিক্সিং'। হেরোইন-এর বড়ি চামচেয় রেখে দেশলাই দিয়ে গরম করে গালিয়ে নিজেই নিজের শরীরে ইনজেক্ট করছিলো লিণ্ডা। আমাদের চিন্তা যদি ভুলক্রমে হাওয়ার বুদবুদ ঢুকে গিয়ে থাকে, কিম্বা যদি হেপাটাইটিস ইনফেকশন হয়। এসব ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। ডাক্তার এসে জানালেন যে ভয়ের তেমন কারণ নেই তবে ওকে ভালো হয়ে উঠলেই বিশ্রাম নিতে হবে অন্তত দু সপ্তাহ একটা থেরাপির জন্য। অবাক কাণ্ড, আফগান ডাক্তাররা অসাধ্য সাধন করলেন। লিণ্ডা ওর মৃত্যুমুখী নেশা ছেড়ে দিলো তিন মাসের মধ্যে। এখন এম-এ পড়ছে দেশে। কাবুলে মাঝে মাঝে আসে। আরেকটি বিচিত্র ঘটনা। হোটেলে হঠাৎ বাংলা ভাষায় কে কথা বলে। বসার ঘরে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যিই এক বাঙালী পরিবার। বাংলাদেশের এক ভদ্রলোক পশ্চিম পাকিস্তানের ইনসিওরেন্সের বড় অফিসার ছিলেন। প্রাচীন পথ ধরে আলুর ট্রাকে লুকিয়ে আফগানিস্তানে পালিয়ে এসেছেন। যথেষ্ট অক্সিজেন না থাকায় ওঁর তেরো বছরের মেয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। ভদ্রলোকের কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই। হোটেলের সবাই মিলে ওঁকে আটশো টাকা তুলে দিলাম। পরদিন হোটেলের সামনে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের গাড়ির জমায়েত। ভদ্রলোক প্রচণ্ড ব্যস্ত, একটা ছোটো খাটো প্রেস কনফারেন্সও দিয়েছেন হয়তো। তারও পরের দিন হোটেলের ম্যানেজার একটা খাম দিয়ে গেলেন আমাদের একজনের হাতে, তার আটশো টাকা। কোনো ধন্যবাদ চিরকুট নেই। বিদেশীদের কাছে আমিই ওঁর হ'য়ে

ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম।

কাবুল থেকে দক্ষিণের পথ ধরে বাসে কান্দাহার, সেখানে দুদিন হোটেল বামিয়ানে মৌলাদাদ-এর রান্না খেয়ে হীরাট। পথে চেঙ্গিস খাঁ-র গজনীতে কয়েক ঘণ্টা। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই তাই এই তাড়া। গ্রীসে ফিরে গিয়ে পড়ানো শুরু করতে হবে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে। গতবার প্রচুর ঘুরেছি এদেশে, এবার পারস্যে একটু সময় কাটিয়ে কনস্তানতিনোপল ভালো করে দেখতে চাই। কয়েকটা দরকারী তথ্য জানাই। কাবুল থেকে প্রত্যেকদিন বাস ছাড়ে বড় বড় শহরগুলির জন্য। কান্দাহার যেতে লাগে দশ ঘণ্টা। সরাসরি হীরাট যেতে পনের ঘণ্টা, ভাড়া যথাক্রমে ষোলো টাকা এবং পঁচিশ টাকা। দেশের যে-কোন প্রান্তেই চলে যাওয়া যায় ওই টাকার মধ্যে। বাসে সঙ্গে খাবার রাখা বাঞ্ছনীয় রুটি, পনির, ফল ইত্যাদি। সাধারণত শুকনো ফলমূল খেয়ে দিন কাটানোই ভালো তাতে শরীর ভালো থাকে এবং খরচও কম হয়। যাদের খিদে বেশি তাদের আফগানিস্তানে একটু অসুবিধে। অনেকেই দোকানের রান্না খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ইরানের ভিসা কাবুলের ইরান দূতাবাস থেকে নেওয়াই ভাল, নইলে কান্দাহার বা হীরাটে হাঙ্গামা হয়। নেহাৎ কোনো রাজনৈতিক গোলযোগ না থাকলে ট্রানজিট ভিসা সহজেই পাওয়া যায়। হীরাট থেকে বাসে সীমান্ত ঘাঁটি ইসলাম কোয়ালা। তিন-চার ঘণ্টার পথ। এই ইসলাম কোয়ালায় সেই মাথা পাগলা লোকটি যদি এখনও অফিসার থাকেন তাহলে তিনি এশিয়ান ও ইওরোপীয়ানদের আলাদা ঘরে বসতে বলবেন প্রায় অভদ্রভাবেই। তাতে উত্তেজিত হবার কিছু নেই, উনি বর্ণভেদে বিশ্বাসী আহাম্মুক নন। কিছুক্ষণ

পরেই বোঝা যাবে অত্যন্ত রসিক লোক। এই পৃথকীকরণের একটা কারণ হোলো নিষিদ্ধ জিনিসপত্র পাচার চেক করার জন্য দু ঘরে ভাগ করলে হয়তো ওঁর কাজের সুবিধে। পরে আবার দুদলকে মিলিয়ে দেন। সীমান্ত অতিক্রম করে আমরা মাশাদ-এর বাস ধরবো।

আফগানিস্তান পারস্যের ছায়া-অনুগামী। ওখানে যেমন নিজেকে খানিকটা নির্ভার লেগেছে, যেন আপাত-অর্থময় অতিরিক্তগুলি ঝরে গিয়ে থেকে গেছে শুধু ক্ষণ-দর্শনের এক কম্পমান উপলব্ধি, বহুরেখ ও উত্তেজনা স্তব্ধ; তেমনি পারস্যে প্রবেশ করে মাশাদের দিকে যতোই এগোই ততোই ঘিরে ধরে অন্ধ নিয়তির অধীন এক মরুসত্য। এই-ই সেই খরখিন্ন খোরাসান, ওমর খৈয়ামের ইন্দ্রিয়-উচ্ছলিত দেশ। এখানেই ওমর লেখেন তার শান্ত-উদভ্রান্ত সুফী-ঘরানার পৃথা-পদাবলী, রুবাইয়াৎ, কান্তিচন্দ্র ঘোষের অদ্যাবধি অপরাস্ত তর্জমায় যার আস্বাদ বাংলাভাষার পাঠক ভুলতে পারে না। 'সব ক্ষণিকের, আসল ফাঁকি; সত্য মিথ্যা কিছুই নাই', কিম্বা 'উর্ধ্বে অধে, ভিতর বাহির, দেখছো যা সব মিথ্যা / ফাঁক ক্ষণিক এসব ছায়ার বাজী, পুতুল-নাচের ব্যর্থ জাঁক।' অনন্ত নৈরাশ্যের মধ্যে তীব্র কাঁটার মতো এখানেই ফুটে উঠেছিলো ওমরের গোলাপ-জিজ্ঞাসা 'কার দেওয়া সে লালচে আভা, হৃদয়-ছ্যাঁচা শোণিত ছাপ।' প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, 'উত্তর অবশ্য, ওমর তোমার। এই রক্তে-নাওয়া গোলাপগুলির মুখে একটি সহাস্য ডোণ্ট কেয়ার ভাব আছে।' কান্তিচন্দ্র তাঁর দিলরুবার ছড়ের টানটি নিশ্চিতভাবে খোরাসানী সুরেই টেনেছিলেন, যেমন টেনেছিলেন নজরুল তাঁর অনেক গানে।

বৃদ্ধ ইয়ুসুফকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'বলো, এই 'কুছ পরোয়া নেই' ধূলিতিক্ষ খোরাসানী হাসির উৎস কোথায়।' ইয়ুসুফ যদিও মাশাদ-গামী বাসে আমাদের সহযাত্রী, নিজেও নিহান টুর কোম্পানীর তেহরান-ইস্তমবুল ট্রিপের বাস চালান মাঝে মাঝে। আমার নানা প্রশ্ন শুনে হাসেন আর টুকরো টুকরো গল্প ছাড়েন। বলেন তোমার সব প্রশ্নেরই উত্তর হলো সাফ-সুফ-সুফী। তুমি হিন্দুস্তানের লোক সাফসুফ বাত বোঝো নিশ্চয়ই! মনে মনে ভাবলাম সত্যি সত্যি সাফসুফ বাত বোঝার দাবি করি কী করে, সে জায়গায় কি আমরা, তথাকথিত শিক্ষিতরা আছি? যাই হোক, ইয়ুসুফ ততোক্ষণ আমাকে মৌলা দো-পিয়াজার সংজ্ঞাবলী শোনাতে শুরু করেছেন।

উৎসাহী পাঠক লণ্ডনের কোয়ারটেট বুকস প্রকাশিত ইদ্রিশ শা-র 'ক্যারাভান অফ ড্রীমস' বইটিতে এরকম আরো অনেক উক্তি-প্রবাদ-কাহিনী পাবেন। ইয়ুসুফের কাছ থেকেই আমি বইটি উপহার পাই। কয়েকটি এখানে তুলে দিচ্ছি। রিপোর্টার, ইঁদুরের গর্তের সামনে ঠায় বসে থাকা বেড়াল। সমাজ, অসম্ভবের আশায় সমবেত যুক্তিহীনের দল। দারিদ্র্য, বিবাহের ফল। বুদ্ধিজীবী, যার কোনো হাতের কাজ জানা নেই। জ্ঞান, যা অজান্তে অর্জন করা যায়। সমর্থক যে কিছু একটা বলবেই। আবেগপ্রবণ, সেই পুরুষ বা নারী যে ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছে ভাবে। কবি, গর্বিত ভিক্ষুক। বন্ধু, পার্থিব সারবস্তু। ঈশ্বরের তরবারি, দরিদ্রের ক্ষুধার্ত পাকস্থলী। এবার ইয়ুসুফের প্রশ্ন, সাফসুফ মনে হচ্ছে? ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে আরো কয়েকটি ফারসি প্রবাদ ছাড়েন, যেমন: বস্তুটি যতোই খোলতাই হোক না কেন বেশিদিন থাকবে না বাজারে। চুলে না হয় কলপ দিলে, কিন্তু মুখে? মৃতেরা

জীবিতের ওপর নির্ভর করে। শেষেরটা কেমন? যথেষ্ট অন্তর্ভেদী সাফসুফ তো? আচ্ছা, এবার একটা দরবেশী টুকরো কথা শোনো। একজন দরবেশকে এক গৃহস্থ জিজ্ঞেস করলেন 'কেন তোমাকে আরো বেশি করে বারবার দেখি না।' দরবেশ উত্তর দিলেন, কারণ 'কেন তোমাকে আরো বেশি করে বারবার দেখি না' এই শব্দরাজি 'কেন তুমি আবার এলের' চেয়ে সহস্র গুণ বেশি মধুর।' ইতিমধ্যে মাশাদ শহরের প্রান্তে গগনেন্দ্রনাথ স্টাইলের এক কোঠাবাড়ির সোয়া দুতলার ঘরে আমরা ইয়ুসুফের অতিথি। দিনের বেশির ভাগ সময় শহর ও খোরাসানে অন্যান্য আধাশহর, গ্রাম প্রান্তর, ঘুরি আর মাঝে মাঝেই সকালে বা রাত্রের দিকে ওঁর সঙ্গে আমাদের সাফ-সুফ-সুফী আড্ডা বসে। দশম-একাদশ শতাব্দীর সুফী ভাবনার উদ্ভবের কথা, আল গাজেল, হাফিজ জামী, রুমী ও ওমরের কথা। বর্ষীয়ান এই কর্মী-দার্শনিক এখনও কাজে অবসর নিতে চান না, এক ছেলে ফ্রান্সে ডাক্তার, অন্যজন সিরাজে শিক্ষকতা করে। স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে তিনি মাশাদেই জীবন কাটালেন, ইতিমধ্যে দুবার কেবল মক্কা মদিনা ঘুরে এসেছেন। বাড়িতে অজস্র বই, বাস চালানোর লম্বা পাড়ি থাকলে সঙ্গে যে-সব বই রাখেন তার মধ্যে রুমীর 'মথনভী' থাকবেই। সারা পারস্যে এই গ্রন্থটিকে ফারসি-কোরাণ বলা হয়।

একদিন সকালে জলখাবার খেয়ে বেরোচ্ছি, হঠাৎ ইয়ুসুফ জিজ্ঞেস করলেন কোথায় যাচ্ছি। সাধারণত এধরনের প্রশ্ন করেন না। আমি বললাম মসজিদের দিকে যাচ্ছি, জানি আমাদের ঢোকা নিষেধ তবু বাইরে থেকে যতোটা দেখা যায়। ইমামরেজার সমাধিতে অবশ্য ঢুকতে দেবে। এক পলকের জন্য গম্ভীর হলেন, স্ত্রীর সঙ্গে একটু

ফিশফিশ করে আমাকে বললেন 'খানমকে রেখে যেতে পারো না?' পরক্ষণেই, আমরা কিছু বলার আগেই আবার বললেন, 'ঠিক আছে চলো আমিও অফিসে যাব ট্রিপের খোঁজ করতে, তোমাদের এগিয়ে দেবো খানিকটা। আজ আমাদের এক বিশেষ পরব শুরু হোলো, শহরে খুব ভিড়।' মসজিদ চত্বরের দিকে আমরা এগোচ্ছি। দূর থেকে ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে দুই নভোসঞ্চারী গম্বুজ। ভিড় বাড়ছে তো বাড়ছেই। ইয়ুসুফের অফিস এসে গেল, বললেন, বেশিক্ষণ এই ভিড়ে থেকো না, ইমামরেজা দেখে মসজিদের চারপাশে একটা চক্কর মেরেই বরং আমার অফিসে চলে এসো, একসঙ্গে চেলো-কোবাব খাওয়া যাবে কোথাও।' ভীড় ঠেলে এগোতে এগোতে আমরা চলে এসেছি শহরের কেন্দ্রপথ খিয়াবন-এ-তেহরানে। বিশাল চওড়া রাস্তা, লক্ষ লক্ষ লোক গিজগিজ করছে। ওপারে, একদিকে ইমামরেজার-স্মৃতিধন্য পবিত্র দরগা আর অন্যদিকে গওহরশাদ মসজিদ। একটির গম্বুজে টারকোয়াজ নীল, অন্যটির সূর্য-ক্রোধ সোনা। সে ভাবা যায় না। একমাত্র কনস্তানতিনোপলের সুলতান আহম্মেদ মসজিদ আর সন্ত সোফিয়ার গির্জার সঙ্গে তুলনীয়। ক্যারলের কাঁধ ডান হাতে আড়াল করে জনস্রোত ঠেলে ঠেলে কোনোক্রমে এগোচ্ছি আর কখনো কখনো মাথা ঘুরিয়ে ওই দুই গম্বুজের 'স্বর্গখেলনা' দেখছি। হঠাৎ মনে হোলো ডান হাতে মর্মান্তিক এক শক খেলাম। কনুই-এর পর হাতখানা আর আছে কিনা তা-ও মালুম হচ্ছে না, ব্যথায় বসে পড়েছি রাস্তায়। শেষে কি জনস্রোতের চাপেই পিষে যাবো নাকি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাতের সাড় খানিকটা ফিরে পেতেই দেখি চোখের সামনে বোরখাবৃতা এক মূর্তি। ছেঁড়াখোড়া বৃদ্ধার গলায় 'আলখুবইলফান

তুখাণি আদব কেহাবান তখ শিন শিন’ জাতীয় কী সব চীৎকার আমাদের দিকে শাঁ শাঁ করে ছুটে আসছে। মনে হয় ‘বেত্‌তমিজ’ শব্দটা ওই ধ্বনি খ্যাকানির মধ্যে কোথাও ছিলো। আমাদের হতবাক অবস্থা দেখে জনতাও খানিকটা বিমূঢ়। ইতিমধ্যে প্রায় নবী-র মতোই এক লম্বা চুল নবীন ইরানীর আবির্ভাব। ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে যা জানলাম তার মর্মার্থ এই : পবিত্র ধর্মস্থানের দৃষ্টিপরিধির মধ্যে ক্যারলের পিঠে হাত রাখার দৃশ্য ভীষণ গোঁড়া এই বৃদ্ধার সহ্য হয়নি। ভীড়টিড়ের কোনো যুক্তিই তাঁর কাছে গ্রাহ্য নয়। এটা অত্যন্ত অধার্মিক কাজ তাই সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য তিনি ঠিক তাক করে আমার কনুই গ্রন্থিতেই মেরেছেন এক মোক্ষম ঘা। ছেলেটি চোখ টিপে হাসলো আমরা দুজনেই সামনে ঝুঁকে ডানহাতের চেটো আকাশের দিকে রেখে ওপরনীচ দুলিয়ে মাফ চাইলাম, যেন একসঙ্গেই সুর করে বলে উঠলাম ‘নাকেখত নাকেখত’। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও অত্যন্ত বদখৎভাবে বকবক করতে করতে তিনি চলে গেলেন।

দুপুরে ইয়ুসুফের সঙ্গে চেলো-কাবাব খাওয়ার কথা। অফিসে গিয়ে ওঁকে সকালের ঘটনাটা বলতেই আরেক হাঙ্গামা, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এই জন্যেই আমি একটু চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম তোমরা মসজিদের দিকে যাচ্ছো শুনে। তেহরানের সঙ্গে মাশাদের আসমান-জমিন ফারাক। যে ওমর-রুমী উদার আত্মীয়তার গান গেয়ে বেড়ালো আজ তাদেরই সবকিছু উড়িয়ে এখানে রাজ্যের গোঁড়ামির ভিড়। তোমরা পরদেশী মেহমান ভালোবেসে এসেছো খোদাতাল্লার এই ধুলোর বাগিচায় আর তোমাদেরই কিনা— ছিছিছি। ক্যারলের হাত দুহাতে ধরে বলে উঠলেন, ‘খানম আমি

তোমার পিতৃপ্রতিম বন্ধু। তোমার স্বামীর এই নিগ্রহের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।' 'না, না, এ কী করছেন, এরকম তো দুনিয়ার সর্বত্রই ঘটে, হিন্দুস্তানেও ঘটে। আমরা কিছুই মনে করিনি, আপনি দয়া করে অযথা এ নিয়ে অস্থির হবেন না।' কে শোনে সেসব কথা, লজ্জায় ইয়ুসুফের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সমস্ত অলঙ্কারের আড়াল ভেদ করে ইয়ুসুফী বিনয়ের নিখাদ সত্যতা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। সেই বিনয় অতিথিকে অর্থাৎ অপর মানুষের আবরণহীন আত্মীয়তায় আবদ্ধ করে।

বাংলা চাউল বা চাল শব্দটা কি ফারসি থেকে এসেছে? সংস্কৃতে তো তণ্ডুল। চেলো-কাবাব শুনে একেবারে থ মেরে গেলাম এদেশে। গরম ধোঁয়া উঠতে থাকা এক থালা সরু সুগন্ধি চালের ভাত, চৌকো কয়েকখানি মাখনের টুকরো, রূপোলি ডিম্বাধারে দুখানি কাঁচা ডিম, এক বিঘৎ লম্বা ঝলসানো মাংসের পেটি, একবাটি শশার-কুচি-ভর্তি ঝাঁঝালো ঘন-তরল টক-নোনতা দই যাকে ফারসিতে দোঘ বলে আর একবাটি মিশ্রিত ফলকুচি—এই হোলো চেলো-কাবাব নামক পারসীক আহার-অনুষ্ঠান।

ভাতের স্তূপের চূড়োয় গর্ত করে তাতে মাখনের টুকরো ফেলে দেওয়ার পর ডিম দুটো ফাটিয়ে আলতোভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। এবার কেবল মাংসের পেটিটিকে চেরা জায়গায় খুলে নিয়ে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এই অনুষ্ঠানটির প্রচলন আছে ইরানে। অবস্থা অনুযায়ী এর রকমফের ঘটে। আরেকটি প্রথারও চালাও চল দেখা গেল এদেশে এসে, নারশিলা বা গড়গড়ার ব্যবহার। সর্বত্র এর ছড়াছড়ি। আধঘণ্টা গুড়গুড় করে তামাক টানলেই বেশ

পানকৌড়ি নেশা হয়, বিশেষ করে তার আগে যদি চেলো-কাবাব চলে। সাধারণ আনন্দ উপভোগের আরেকটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ হোলো ফারসি গালিচা। দরিদ্রতম পারস্যবাসীরও একটি গালিচা আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই গালিচা কয়েকটি প্রজন্ম ধরে পাতা হয়ে আসছে। যে-কোনো সংসারেরই এটি এক গর্বিত ঐশ্বর্য। ফারসি পরাদৃষ্টি ধরে থাকে দুটি হাত, একটি তার ইন্দ্রিয়দীপ্ত উপভোগ দর্শন বা এপিকিউ-রিয়ানিজম আর অন্যটি সেই উপভোগেরই আকাঙ্ক্ষিত বিস্তার, সুফীশূন্যতা। আধৃত বস্তুটির নাম মহিমান্বিত জীবন।

ইয়ুসুফের উষ্ণ-আতিথ্যের মায়া কাটানো মুশকিল। সাতদিনের জায়গায় দশদিন হয়ে গেল। বারবার অনুরোধ করেছেন থেকে যেতে, ওঁর কাছে 'ওভারস্টেয়িং দি ওয়েলকাম' বলে কিছু নেই। ওদিকে তেহরানে আমাদের আরেক বন্ধু মাসুদ অপেক্ষা করে বসে আছে। তার বোন ফারিস্তের বিয়ে সামনের সপ্তাহে। মাসুদরা ইহুদী, আমরা এমনিতেই আমাদের পশ্চিমী ইহুদী বন্ধুদের সমঝে চলি, তার ওপর প্রাচ্যের ইরানী ইহুদী। ইয়ুসুফ আরেক কাঠি জুড়ে দিলেন 'তারও ওপর রাশতী ইহুদী। ওরেব্ বাবা তোমরা তাহলে সত্যিই এসো। যদি জানতে পারে আমি তোমাদের আটকে রেখেছি, তাহলে হয়তো সোজা এখানে এসেই হামলা করবে।' মাসুদের পরিবার এসেছে ক্যাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম কূলবর্তী বজরগান-তাব্রিজ অঞ্চল থেকে। এদিককার ভাষা এবং আচার ব্যবহার একটু রোখা প্রকৃতির, পূর্বতন তুর্কীস্তানের অনুষঙ্গ রয়ে গেছে। লোকজনদের বলা হয় রাশতী। রাশতী সারল্য ও তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে নানারকম রসিকতা আছে ফারসি-সমাজে।

মাশাদ ছাড়লাম অবশেষে। ইয়ুসুফের কাছ থেকে যাত্রা-পূর্ব আড্ডায় একটি গল্প উপহার পাওয়া গেল। কথা হচ্ছিলো মানুষের মধ্যে নিরর্থক ভেদ-বিভেদ নিয়ে। ইয়ুসুফ তাঁর দিব্যগ্রন্থ 'মথনভী' খুললেন। চারজন লোককে একটি মাত্র অর্থমুদ্রা দেয়া হয়। প্রথমজন পারস্যবাসী, সে বলে এ মুদ্রা দিয়ে আমি আঙুর কিনবো। দ্বিতীয় জন আরব, সে বলে আমি এটা দিয়ে ইনাব কিনব। তৃতীয় জন তুর্কী, সে জানায় যে সে ইনাব চায় না, সে চায় উজুম। চতুর্থ মনিবটি ছিল য়ুনানী বা গ্রীক, সে চীৎকার করে ওঠে না না, আমি ওটা দিয়ে কী কিনবো জানো? স্তাফিলিয়া। ওরা কেউই জানতো না এইসব নামের অর্থ কী, তাই মারামারি বেধে গেল। ওদের কাছে সীমিত তথ্য ছিলো, কিন্তু ছিলো না সত্যকার জ্ঞান। একজন জীবন্ময় জ্ঞানী ব্যক্তি অনায়াসে ওদের ঝগড়া মিটিয়ে দিতে পারতেন এই বলে, 'আমি তোমাদের সকলের প্রয়োজন মেটাতে পারি ওই একটিমাত্র অর্থমুদ্রারই সাহায্যে কেবল তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস করো। ওই একটি মুদ্রাই তখন চার হবে, আবার পরস্পর-বিরোধী চারও থাকবে এক। জ্ঞানী জানেন যে চারজনই, যে-যার ভাষায়, যা পেতে চায় তা হলো, নিখুঁতভাবেই আঙুর। এবং মুখ ভরে ইচ্ছে করলেই ওরা তার রস খেতে পারে। গুনার মিরডাল কি এর চেয়ে বেশি অর্থসম্ভব?

মাশাদ ছেড়ে তেহরানের দিকে যেতে যেতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। নিহান টুরের ঝকঝকে আধুনিক বাসের ভেতর থেকে কফি-রঙের দৃষ্টি-স্নিগ্ধ জানলার বাইরে যে দৃশ্যাবলী মাঝে মাঝেই উদ্ভাসিত হয় তা যতোবারই দেখা যাক না কেন অবিশ্বাস্য মনে হবে। এটি আমাদের দ্বিতীয় দর্শন। ময়দানবী যন্ত্রসভ্যতা এবং টগবগে পেট্রোডলার

উদ্ধতভাবে ইরানকে যুক্ত করেছে বর্তমান শতাব্দীর ভারসাম্যহীন উন্মাদ ভবিষ্য-দৌড়ে। তেহরানে এলে আলো নয়ন ধাঁধা আমার, আলো নরক-করা। এমনকি নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার পাড়ার নিও(ন)নরকও এতোটা পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন উটকো নয়। কিছুদিন আগেই দক্ষিণ ইরানের পার্সিপোলিসে গৌরব-মোচ্ছব শেষ হয়েছে। গরীব দেশ থেকে এসেছি বলেই যে এই উদ্ধত বিদ্যুৎ-শক্তির অপচয় অশোভন লাগছে তা নয়, সম্পূর্ণ পরম্পরাহীন রুচিচ্যুত মেগা-লোমেনিয়ার পাশাপাশি বিনয়ী কারুঋদ্ধ ফারসি কণ্ঠস্বর ও মুখচ্ছবিটি মেলাতে পারছি না বলেই প্রধানত হতাশ হচ্ছি। ইরানের জাগতিক উন্নতি অনস্বীকার্য, সে আজ বিশ্ব রাষ্ট্র শক্তিসমাজের অন্যতম সভ্য। কিন্তু ইরান কি তার আত্মবিদ্যা বিসর্জন দেবে? টেকনলজি ও ট্র্যাডিশনের এরকম হেড অন কলিশন আর কোনো দেশে দেখিনি। অথচ কতো নতুন রাস্তা-ঘাট-বাড়ি-প্রাসাদ-বিশ্ববিদ্যালয়-টানেল-প্রকল্প-নাট্যশালা!

দীর্ঘ বাসভ্রমণ ও পর্বত-চক্করী-পথ শরীর যথেষ্ট কাহিল করে ফেলেছে। যতোই আরামের বাস হোক না কেন ক্যাস্পিয়ানী হাওয়ার চাবুক, বাস থামলেই, আর ছোটো শহরগুলির উদ্‌ভ্রান্ত আধুনিক চালিয়াতির ধাক্কা বোধহয় কোনো এক রাশতী ফ্লু বাধিয়ে বসেছে। বাস টার্মিনালে ভাইবোন ও স্ত্রীসহ মাসুদ দাঁড়িয়ে। নামামাত্রই শুরু হোলো নিখাদ ফারসি আলিঙ্গন ও গণ্ডচুম্বন। সর্বশরীরে ব্যথা নিয়ে ফ্লুতে কাহিল অবস্থায় মাসুদেরই উপর্যুপরি আলিঙ্গন সামলাতে সামলাতে মাসুদেরই একটা গল্প মনে পড়লো। মাসুদের সঙ্গে সাদের মতোই আমাদের বন্ধুত্ব জমে আমেরিকায়। আলোচনা হচ্ছিলো

ওয়াসপ্ বা হোয়াইট অ্যাংলো স্যাকসন পিউরিটান নীতিবোধের ইনহিবিশন ও স্পর্শশূন্যতা বিষয়ে। আমরা আমাদের ঘনিষ্ঠ আমেরিকান বন্ধুদের খুব খোঁচাতাম এ নিয়ে। এইরকম এক আড্ডাতেই মাস্যুদ তার বেরাদরী আলিঙ্গনের গল্পটি ছাড়ে।

একজন ইরানী ছাত্র, ফেরিহুন, আমেরিকায় পড়াশুনো করতে আসছে। নিউ ইয়ার্কের কেনেডি এয়ারপোর্টে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে তার বাল্যবন্ধু আফতাব। বিশাল বাস্তব তাচ্ছিল্য করা আলো-বোতাম-করিডোর আর সচল স্বপ্নধাপ পেরিয়ে একটা সবুজ রেলিং-এর ধারে এসে ফেরিহুন তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো দাঁড়াতেই তার চোখে পড়লো, বিচিত্র দশদিকমুখী অঙ্গভঙ্গি করতে থাকা, উলের ভালুকের মতো দেখতে, আবছা এক মূর্তি। আরেকটু ভালো করে নজর রাখতেই নীচের লাউঞ্জ থেকে স্পষ্ট ছুটে এলো টর্চের আলো পড়ার মতো আফতাবের পরিচিত অথচ যথেষ্ট অন্যরকম মুখচ্ছবি। এতোক্ষণে ফেরিহুন শুনতে পেলো আফতাবের পাহাড়ী গলার ফারসি। 'খবরদার, এখানে কিন্তু কোনোরকম কোলাকুলি আর চুমু খাওয়া নয়। বুঝলি! ওসব একেবারে নয় এখানে।' ফেরিহুন ওপর থেকেই চেঁচায় 'কেন? এই যে চারপাশে সব ছেলেমেয়েরা চুমু খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, আরো কতোরকম জড়াজড়ি করছে?' নীচ থেকে আফতাব, 'আরে বেতরিবৎ ওসব তুই বুঝবি না। এখনও খোকা রয়ে গেছিস। এসে চুপচাপ হ্যাণ্ডশেক করবি, বড়ো জোর আমার কাঁধটা দু-হাতে ধরে একটু ঝাঁকাতে পারিস। ব্যস।' সারাক্ষণ এটা সেটা নিয়ে খেজুরে আলাপ সেরে ব্রুকলিনের ফ্ল্যাটে ঢোকা মাত্রই দরজা বন্ধ করে বন্ধুর নিঃশব্দে গজগজ করা ভাব কাটাবার জন্য আফতাব এবার বলে 'নে

যতোখুশি চুমু খা আর পারিস তো পাঁজর ভেঙে ফেল তোর কোলাকুলির চাপে।' কোলাকুলিটা হোলো ঠিকই, তবে অনেকটা কুলকুচির মতো, ফেরিদুন ইতিমধ্যে ওয়াস্প্ মরালিটির কড়া থাপ্পড় সামলাতে ব্যস্ত। ফ্রেশম্যান কোর্সের রেজিস্ট্রেশনটা কোথায় হবে, বরং তারই খোঁজ করা যাক। শুধু সমগ্র মধ্য-এশিয়া জোড়া দেশগুলিতেই নয়, বলকান ভূখণ্ড এবং ভূমধ্যসাগর-বৃত্তের দেশগুলিতেও প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে স্পন্দিত হচ্ছে স্পর্শের এই আদিম অভ্যর্থনা ও বিদায় উৎসব এবং তাও শুধু মানুষে মানুষে নয় মানুষ ও দেবতাতেও। বাইজেনটাইন গির্জাগুলিতে দেখেছি কুমারী মেরীর শরীরে মানুষের চুম্বন ঝরে পড়তে। তথাকথিত নিষেধ-মুক্ত আমেরিকান বন্ধুদের কাছে আমরা এ-সব গল্প করতাম ওদের সংস্কৃতিগত নিষেধগুলোকেই খুলে ধরবার জন্য। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানাতাম যে, ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারসূত্রে আমরাও এখন মেকী-মুক্তির খেলাঘর বা প্লে-হাউস বাঁধছি।

তেহরানে মাসুদের এলাহি আতিথ্যে কয়েকদিন বিশ্রামও হোলো, ভালো-মন্দ ফারসি খাবারের সঙ্গেও পরিচয় হোলো। মাসুদের বোনের বিয়ের ব্যাপারে বাড়িতে প্রতিদিনই আত্মীয়-স্বজনের ভীড়। সেই সূত্রেই কিঞ্চিৎ বাড়তি খানা-পিনার আয়োজন। ইহুদী জমায়েতের বৈশিষ্ট্য বোঝানো মুশকিল, বিশেষ করে তা যদি 'সেফারদিক' ইহুদী আড্ডা হয়। মোটামুটি তিন রকমের ইহুদী আছে, 'আশকেনাৎস' অর্থাৎ যাঁরা প্রতীচ্যের, 'সেফারদিক' অর্থাৎ যাঁরা প্রাচ্যের এবং ব্রাত্য-প্রতীচ্যের, আর 'সাবরে' অর্থাৎ যাঁরা খাস ইজরাইলেই জন্মেছেন ও বড়ো হয়েছেন। মাসুদরা স্বভাবতই সেফারদিক। দূর-দূরান্ত থেকে

গরীব, আধা-গরীব, সমশ্রেণীর এবং কুৎসিতভাবে ধনী—নানা ধরনের আত্মীয়রা এসেছেন। মাসুদের বোনের ভাবী শ্বশুর রোজ এসে আড্ডা দেন, আর তারই মধ্যে মাঝে মাঝে নিজের মনে অদ্ভুত সুরে গান করেন। সেই সুর কখনও মনে হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ, কখনও কৃষ্ণসাগরের নিমজ্জমান বন্দর, ডাখাউ-এর কঙ্কালভস্ম শেষ রাতের হার্লেম কিম্বা কখনও 'কিছুই তো হোলো না হায়'। এই কি বিবাহের গান! অথচ আর্ত রাখালী সোপ্রানোতে ভদ্রলোক গেয়ে চলেন এই সব গান, মাঝে মধ্যে থামেন, বিয়ের বাজারের তদারকী করেন, ছেলে-বুড়ো সকলের সঙ্গে রসিকতায় মাতেন, আবার তেমনি ভুম করে বেহালার টানের মতো ছুটে যান তাঁর নিজস্ব সুখে-দুঃখে সমুদ্বিগ্ন গানে মনে। জীবনে কখনো সঙ্গীতের এহেন পরা-বাস্তবিক ব্যবহার শুনিনি। এরই কাছাকাছি আরেকটি অভিজ্ঞতা হোলো পারস্যের সর্বত্র ছড়ানো কালো জোব্বা পরা, মাথায় কালো পাগড়ী জাতীয় কিছু জড়ানো, হাতে একটি লাঠি, চাপ দাড়ি, সাধারণ মেঠো হাসির একটি মুখ আর সব মিলিয়ে নিতান্তই সহজভাবে দাঁড়ানো। যখনই দেখি, কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারি না। আর কোথাও দেখিনি, কেবল পারস্যে। ছবিটির কোথাও এক বিন্দু মানুষ ছাড়ানো আলো বা মহত্ব নেই এমনকি রবীন্দ্রনাথের ছবিতেও যা পাওয়া যায়। আশ্চর্য, যাঁকে সকল অবয়বের অতীত বলে তাঁর অধিকাংশ অনুগামীরাই ভেবেছেন, তাঁরই এই অত্যন্ত নিকট, পার্থিব ও রূপময় বিচরণ পারস্যে কি করে সম্ভব হোলো? জানতে ইচ্ছে করে।

তেহরানের উপকণ্ঠে ধামাবন্দ পাহাড়ে বসে ঘণ্টা দুয়েক ধরে গুড়-গুড় করে নারগিলা টানছি আর এইসব ভাবছি। হয়তো নেশার

ভাবনা। চারপাশে উঁচু নীচু পাহাড়ের ধাপে গালিচা ছড়ানো, দূরে ইতস্তত লোকজন বসে, দল বেঁধে বা জোড়ায় জোড়ায়। ফারসি সুন্দরীদেরও দেখা যাচ্ছে। সরু একটা ঝর্ণাও আছে পাশে। তার ওপর দুপাড় জুড়ে বড়ো গালিচায় ঢাকা চৌকি পাতা। তরুণ-তরুণীদের অনেকে সেইসব চৌকি কাঁপিয়ে বসে। অধিকাংশ পুরুষের হাতেই নারগিলা। এ জায়গাটাকে অনায়াসেই একটা নারগিলা ঠেক বলা যেতে পারে। চিরন্তন পারস্যের কিছু একটা থেকে গেছে এইসব আসরে, তা না আর্য না মুসলমান না সাফ-সুফ-সুফী। না জরাথুষ্ট না বাহাউল্লা না রুমী না জেন্দ অবেস্তা। হয়তো মাজদা, মেধা, মত্ততা, মস্তিম বা সর্বপ্রকার জাঁক তুচ্ছ করে ভেতরকার ঝটিতি আলো। একদা ইব্রাহিম ইবন এদেম নামে এক যুবরাজ মৃগশিকারে বেরোন, যেমন তিনি প্রায়ই বেরোন। এবার একটি মৃগ তাকে প্রশ্ন করে, 'তোমার কি লজ্জা করে না কখনও? এভাবেই কি তুমি জীবন কাটাবে? এরই জন্য বেঁচে আছো?' রাজকুমার খামোখা হঠাৎ এবারেই লজ্জা পেয়ে রাজ্যত্যাগী হয়ে, একা দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাতে চলে গেলেন। সেভাবেই তাঁর মৃত্যু হোলো। মৃগের প্রশ্ন শুনে কি তার আগের একটি অভিজ্ঞতা মনে পড়েছিলো? সেবার তিনি মাঝরাতে ছাদে প্রচণ্ড দাপাদাপি শুনে ওপরে গিয়ে দেখতে পান কিম্ভুত আকৃতির কতকগুলি জীব। তিনি প্রশ্ন করেন 'কী খুঁজছো তোমরা?' তারা বলে 'উট। আমরা উট খুঁজছি।' 'ছাদে উট!' 'বারে! তুমি যে সিংহাসনে বসে ভগবানকে খুঁজছো!' তবু সারা এশিয়া বিশেষত মধ্য এশিয়া জুড়ে ভূমিকম্প, খরা, সামন্ত রাজনীতির খুন-খারাপি, যুযুধানবৃত্তি ও নব্য বণিকতন্ত্র!

কনস্তানতিনোপলের ট্রেনে উঠে বসেছি আমরা। কাবুল থেকেই চন্দ্রহাসের দল যে যার ছিটকে পড়েছিলো নিজেদের পথে, আবার জড়ো হয়েছে এখানে। কিছু মুখ পুরোনো, বেশির ভাগই নতুন। দুখানা বগীতে প্রায় শ'দেড়েক বিদেশী যাত্রীর সাড়ে তিন দিনের যাত্রাপথে নতুন-পুরানো সবাই আরেকভাবে মিলিত হয়। এক সঙ্গে এতোটা সময় যেতে হয় বলে সঙ্গত ভাবেই তুর্কী ও ইরানী রেল-কর্তৃপক্ষ দুটি বগী বিদেশী যাত্রীদের জন্য রিজার্ভ রাখেন। গ্রীষ্মকালে, সপ্তাহে দু'দিন তেহরান ও কনস্তানতিনোপলের মধ্যে এই রেল যাতায়াত চলে। ভাড়া, স্টুডেন্ট কার্ডসহ একশো টাকার মতো। ট্রেন ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম পথে এগোয় তাবরিজের দিকে। যে দুটি দেশ পেরিয়ে এলাম তাদের সঙ্গে ভারতীয় মেজাজের একটা যোগসূত্র নানা পরস্পর বিরোধী অভিজ্ঞতার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়, বিশেষ করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় শিল্প ও দর্শন ঘেঁষা অভ্যাস ও হাবভাবের দিক থেকে। কিন্তু এবার যে দেশে প্রবেশ করবো তার তুল্য জটিল উত্তেজক দেশ আর কোথায়। এমনকি দেশ বললে তাকে ছোটো করা হয়। রাজনৈতিক অর্থে দেশ নিশ্চয়ই কিন্তু ভূখণ্ডজনিত অস্তিত্বে সে তো বিশ্বের ললাট প্রমাণ! ক্যাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমতট ধরে তাবরিজ ছাড়িয়ে ঢুকে পড়লাম এশিয়া ও ইউরোপের দুই কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা দুর্ধর্ষ দুর্মদ তুরস্কে, সেই সঙ্গে আনাতোলিয়ায়, অটোমান ও বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যে অপমানিত ও পরাজিত বীর ঈনিসের দেশে। আগেরবার আসার পথে এর-জেরুম থেকে উত্তরে এগিয়ে ত্রাবজন্দএ গিয়ে কৃষ্ণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। পাহাড় কুরে কুরে বাস দমবন্ধ আমাদের দলটিকে

অতর্কিতে যেন ছুঁয়ে দেয় ভূমিকম্পের পরিণাম স্বরূপ ঘন ছাই নীল কালো প্রকৃতই কালিমাচিহ্নিত উপেক্ষিত কৃষ্ণসাগরে। জগৎ-কাঁপানো নানা বন্দর পাহাড় থেকে এভাবেই উল্টে গিয়েছিলো সৃষ্টির দোয়াত। এবারের পথে পাহাড় ভেদ করে আমাদের বগী ছুটো সোজা এক জাহাজের ওপর গিয়ে উঠলো। জাহাজ ভেসে চললো মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম হ্রদ চার হাজার বর্গমাইলের 'ভান' হ্রদের ওপর দিয়ে। চারদিকে স্মৃতি-বিরোধী মেঘের মতো পাহাড়ের ভিড়। অসুস্থ মানুষের কথা মনে হয়, তার হৃদয়ের অসুখ, হয়তো আধুনিক তুর্কী কবি নাজিম হিকমেতের অস্বস্তিকর কবিতা অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস। আমি তখন স্কুলে পড়ি। আরেকজন বাঙালি, সম্পর্ক-সূত্রে আমার এক মামা, তুরস্কের কোনো এক বন্দর থেকে হয়তো ঈজমীর থেকেই হিকমেতের কয়েকটি কবিতার ইংরিজি অনুবাদ আমাকে পাঠান। সেদিনকার ভারতীয় নৌবাহিনীর সেই তরুণ নাবিক বর্তমানে বোম্বাই প্রবাসী বিখ্যাত বাঙালি সলিল ঘোষ। সেই প্রথম একজন কবির কবিতায় শারীরিক অসুস্থতা ও রাজনৈতিক অসুস্থতার এক আপতিক ভ্রমণ লক্ষ করি। কী ভয়ঙ্কর গলায় হিকমেত ডাকেন ডক্টর! ডক্টর! তুরস্কের সর্বত্র শুনতে পাওয়া যায় সেই ডাক।

রিজার্ভ কামরা হলেও এরজেরুম থেকে অনেক তুর্কী আমাদের বগীতে ওঠে। তার মধ্যে আমাদের খুপরিতে ছিলো আবদুল হামিদ। জার্মানীতে রাস্তা বানাবার কাজ করে। 'সাপ্রেখেন জীং ডয়েচ? জী রয়খেন ৎসু ফীল' বলে সেই যে আবদুল আমাদের সঙ্গে ভাব জমালো আর ছাড়ে না বকবক করা। সিগারেট বেশি খেয়ো না,

চলো তোমরা আঙ্করায় আমার বাড়িতে থাকবে, হুবীসবাডেনে কোথায় ছিলে, আমি ছ'মাসের ছুটিতে এসেছি আবার দু'বছরের কণ্ট্রাক্ট নিয়ে মুনশেনে যাবো, জানো আমিও কেনেডির মতো বলতে পারি ইশ বিন আইন মুনশেনের বরং আমার বলার অধিকারটা একটু বেশি ইত্যাদি ইত্যাদি। আবদুলের মতো হাজার হাজার তুর্কী শ্রমিক ইওরোপকে গড়ে তুলেছে। তাদের নিজেদের জীবন ক্ষয়ে যাচ্ছে বাউহাউস সভ্যতার প্রয়োজনে যদিও আবার কোনোক্রমে টিঁকেও থাকছে তারই 'উদার' উন্নতি খেলনার দৌলতে। জাহাজের ডেকে আলাপ হোলো সেলিমের সঙ্গে। সেলিম ভূতত্ত্বের অধ্যাপক আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবদুল আর সেলিমে লেগে গেল ঝগড়া।

আবদুল আজকালকার রাজনীতিবাজ ছেলেপুলেদের নিন্দে করে আর সেলিম তাদের বুঝতে পারে না, কিন্তু নিন্দে করে না। সে বলে কী করে জানবো। ইতিহাসের কতোটুকু আমরা বুঝতে পারি, আমরা শ্রমিকরা এবং শিক্ষকরা। আর যাও-বা পারি তারও কতোটুকুই বা নিষ্ঠা সহকারে ধরে রাখা যায়। এই এরজেরুম থেকেই তো মাত্র কয়েক যুগ আগে কামাল উড়িয়েছিলো তার ঝড় কিন্তু আজ আবার সেই ন যযৌ ন তস্থৌ, ডক্টর ডক্টর। ছাত্ররা এগুলো ধরতে পারে আর দলে দলে চলে যায় পুনরুদ্ধারের পথে ঠিক যেভাবে ঈনীস গিয়েছিলো। দেবতারা তার সহায় ছিলো, কিন্তু এইসব যুবজনতার সহায় কারা? সেলিম শান্ত ও মৃদুভাষী, শুধু আবদুলকে নয় সহযাত্রীদের অনেককেই সে জয় করে তার লোকবৃত্তময় কথকতায়। করিডোর দিয়ে খাবার ঘরে যাবার পথে যা ঘটলো তাকে সেলিমের ভুয়োদর্শনেরই এক আশ্চর্য নাট্যরূপ বলা যায়। পাঁচ-ছ'টা কামরা পেরিয়ে অতিরিক্তভাবে দীর্ঘ

যে কামরায় ঢুকলাম সেখানে কোনো খুপরি নেই, সীট নেই, বেঞ্চিও নেই ঢালাওভাবে গাদাগাদি করে ঠাসা হাতকড়া পরানো অসংখ্য কিশোর সৈন্য। তাদের হাতে হাতকড়া কেন? সেলিম এদৃশ্য বহুবার দেখেছে। একটি ছেলে ওই হাতকড়া উঁচিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। লালচোখ, দুর্বোধ্য ভাষা, দুহাতের হাতকড়ার চাপে সে আমাকে ট্রেনের কাঁপতে থাকা দেয়ালে চেপে ধরেছে। কেবল 'হিন্দুস্তান' কথাটা বুঝতে পারছি। হঠাৎ দূর থেকে একটা চীৎকার ছুটে আসায় কেঁচোর মতো গুটিয়ে মাটিতে বসে পড়লো সে। একজন রুক্ষভাষী তরুণ অফিসার আকারে ইঙ্গিতে আমাকে এগিয়ে যেতে বললেন। সেলিমের ব্যাখ্যা, ছেলেটি এই অল্পবয়সেই হয়তো কট্টর ধর্মোন্মাদনার শিকার। আমাকে দেখে ভারতীয় এবং হিন্দু আন্দাজ করে ক্ষেপে গিয়েছিলো। ১৯২৮ সালে তুরস্ক নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে ঘোষণা করে।

আঙ্কারা পেরিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে উত্তর পশ্চিমে কনস্তানতিনো-পলের দিকে।

আধুনিক চিত্রকরের আঁকা বিশাল অপ্রাকৃতিক বাদুড়ের মতো দেখতে তুরস্কের পশ্চিম কোণের একটুকরো কেবল ইওরোপে। সেই অংশে রয়েছে কনস্তানতিনোপল। চতুর্থ শতকের মহারাজ কনস্তানতি-নোপল-এর নামেই প্রাচীন গ্রীক বাণিজ্য বন্দর বৈজয়ন্তীধাম বা বাইজানটিয়ম-এর প্রধান পরিচয়। সেজন্যই এই নামটাই এতোক্ষণ ব্যবহার করে এসেছি। অতিকায় য়ুনানী ভাবনা বা মেগালি ইদেয়ার কেন্দ্র হলো এই সৃষ্টি উন্মাদিত ঈশিত্ব, উদ্বুদ্ধ আলোকপ্রাপ্তির শহর। তুর্কীরা এই সব গির্জা মসজিদ ও বন্দর জীবনের নাম বদলে রাখে

নাচ আর ছায়াবিদুষক কারাগিওসিস-এর ছায়ানাট্য। গালাতোর পাশে বসে দেখা যাক সোনালী শিং বা গোল্ডেন হর্নের জল, বসফরাস থেকে ছিটকে এসে ছটফট করছে। সামনেই পেট আইঢাই করা জঁাদরেল রুশী যুদ্ধজাহাজ, দূরে রাজকীয় যাদুঘর তোপকাপী আর ডান পাশে সন্ত সোফিয়ার গির্জা নীল মসজিদ। গালাতা পেরিয়ে ইওরোপীয় রেল স্টেশন বাঁয়ে রেখে সন্ত সোফিয়ার দিকে হাঁটি। গালাতা যেহেতু প্রাচীন গল-এর সঙ্গে যুক্ত সেহেতু ইওরোপীয় রেলপথ তো এখানেই এসে থামবে। আশ্চর্য বসফরাস পেরোলেই কেমন এশিয়া ও ইওরোপের তফাৎটা স্পষ্ট খটখট করে। মাত্র আধ মাইলের দূরত্ব, এপারে উজ্জ্বল রঙরেজিনি, ওপারে মলিন সন্ধ্যার পাড়া। রাত্রি উৎসবের জন্য ফেরী-ভর্তি এশিয়াপারের নরনারী এপারে চলে আসে, ছোটে, বেড়ায়, হাঁপায় মাতাল হয়। নাচে, কেউ কেউ বসফরাস বেয়ে উত্তরের দিকে কৃষ্ণসাগরের কাছাকাছি গা-গরম করা বন-বাদাড়েও ঢুকে পড়ে। এক জিপসীর দলের সঙ্গে ওদিকে গিয়ে গনগনে আগুনের চারপাশে বসে নাচ-গান নেশা করা গিয়েছিলো একদিন। ফ্লেমিংগো নাচের মতোই আচমকা তছনছ করা উচ্ছ্বাসের মধ্যে ঘাগরার-ঢেউ হাতে ধরা ডানার কাপড় আর তার যন্ত্র পাগলামাস ও অ্যাকর্ডিয়নের নেশাগ্রস্ত লাফ, হাত ঘুরতে থাকা রাকীর কারাফি ও হাশীশের সরু নল। ঠিক শোনা গিয়েছিলো হিকমেতের হাত ধরে থাকা সম্ভাষণ 'ডক্টর, ডক্টর, আর কতোকাল।'

পেট্রিয়র্ক আথানাসিয়োস মারা গিয়েছেন। বিশাল শোকযাত্রা পথে। শুধু সংখ্যালঘু গ্রীক, আর্মেনিয়ান নয়, অগণিত তুর্কীদেরও দেখতে পাচ্ছি। বিরোধ ছাপিয়েও কিভাবে মানুষ পরস্পরের পাশাপাশি

হাঁটে, কেন তা কেউ লক্ষ্য করে না! গ্রীসের বা য়ুনানীস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তুর্কী সংস্কৃতির প্রভাব, হয়তো চারশো বছরের শাসনেরই ফল, তবু কিছু অভ্যাস থেকে গেছে রক্তের অন্তর্গত স্রোতে। তেমনি এই ইস্তামবুল কনস্তানতিনোপলের আকাশ-বাতাস ঘিরে এখনও বেজে চলেছে সেই অশরীর আচ্ছাদিত কালস্রোত-উদাসীন বিশাল ঘণ্টার শব্দ ইয়েটস কথিত গং গং গং। সন্ত সোফিয়ায় গম্বুজের নীচে দাঁড়ালে তার নিঃশব্দ গুমরানি শোনা যায়। কোনিয়ায় দরবেশী ঘূর্ণী নাচেও তাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্কের একপাশে ছিলো নাৎসী আক্রমণের চাপ আর অন্যপাশে রুশী 'মুক্তি'র চাপ। আজ তার চেহারা বদল হলেও তুর্কী হৃৎপিণ্ড তেমনিই ধকধক করছে একাধিক চাপে। গোঁড়া ধর্মোন্মাদনা প্রাণবন্ত আধুনিক মুক্তি-অভিলাষ ও শ্রম-উৎসারিত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, অগণিত লোক-ছন্দ, পাশ্চাত্য চক্রান্ত, সব মিলিয়ে ঐশ্বর্যময় এই বীরপুরুষটি এখনও অপমানিত ও চিকিৎসাপ্রার্থী। শহরের সব কটি বড়ো বই-এর দোকানে ঘুরে কোথাও হিকমেতের কবিতার ইংরিজি অনুবাদ পাইনি, শুনেছি মূল গ্রন্থগুলিও নাকি পাওয়া সম্ভব নয়। আজও একশো বছর আগের মতো তুরস্কের কুলি কোমর বাঁকিয়ে নতমুখ অবস্থায় পিঠে গদি বেঁধে মাল বহন করে। প্রচ্ছদের সঙ্গের অনবদ্য কার্টুনটি যে তরুণ ফুটপাত-চিত্রকর ইস্তিকলাল চাঁদেসীতে দাঁড়িয়ে কাঁটায় কাঁটায় তিন মিনিটে এঁকেছিলো সেই তরুণ আমাকে বলেছিল 'জানো তুর্কী কলজে পাথর দিয়ে তৈরী অথচ তা আমাদের সুলতানা কিশমিশের মতোই নমনীয়। হাজার ভূমিকম্প ও রাজকম্পও তাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। আমাদের কর্মজীবী জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগের সম্পর্ক মাটির সঙ্গে, ফাটল

দেখতে দেখতে তারা বড়ো হয়, গোঁফে তা দেয় আর রণকৌশল ঠিক করে, ধরিত্রীই তাদের হাসপাতাল, সেই নিষ্ঠুর ধরিত্রী যে বারবার মাথা ঝাঁকিয়ে সব ভেঙেচুরে দেয়। আবদুল আজ 'আইন মুনশেনের' সেলিম পাহাড়ে পাহাড়ে পাথর কুড়োয় ছাত্রদের জন্য আর তার ছাত্ররা ঘুরে বেড়ায় ক্ষিপ্ত বিপর্যস্ত। এক ডিসকোথেক থেকে আরেক ডিসকোথেকে। তিনদিক জল দিয়ে ঘেরা এই দেশের রাজধানীর রাজপথে ঠেলায় সারি সারি বোতল সাজিয়ে জলওয়ালা জল ফেরী করে 'স্যু স্যু স্যু' 'জল চাই জল জল চাই গো জল'। আমি শুনতে পাই 'আনেস্তি আনেস্তি' পুনরুত্থান পুনরুত্থান।

প্রাচ্য আর প্রতীচ্য, ধরিত্রীর বাগান-সমুদ্র-মরুভূমি পেরিয়ে, ঠিক যেখানটায় সম্মুখযুদ্ধে মাতে সেই বলকান-আনাতোলিয়া আর একফালি চাঁদের দেশগুলিতেই প্রতিদিন অভিনীত হয় পুনরুত্থানের মহাপালা। বড়দিনের চেয়ে অনেক বেশি গভীরভাবে জীবনের সমান্তর এই ঈশার জাগরণ। আশ্চর্য, একাধিকবার এখানকার ইস্টার বা পাসকা উৎসবের ঘটনাময় উদ্ভাস ও বিস্ফোরণ নানাভাবে না জানলে হয়তো কোনোদিনই এর মর্ম উদ্‌ঘাটিত হোতো না আমার কাছে। উপর্যুপরি ভূমিকম্প ও অহরহ অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ এই ভূখণ্ডের মেতেম্‌সিকোসিস বা আত্ম-উদ্ধারণের ধারণাটি হয়তো চিরকালই পুঁথি-লব্ধ থেকে যেতো, বাঁচার দিক থেকে এতো জরুরী মনে হোতো না কখনই। হৃতপ্রাণ মানুষের উদ্‌ভ্রান্ত স্রোত প্রদীপ ও মোমবাতি হাতে ঘুরে বেড়ায় এখানে ওখানে, দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ভাসে তার দ্যুতিময় সত্য। খ্রীষ্ট নিহত হয়েছেন। ক্রুশবিদ্ধ তাঁর রক্তাক্ত শরীর সমাধিস্থ হয় এপিতাফিয়স শোকগাথার মধ্যে। তারপর শুরু হয় পাথর সরানোর কাজ, আগের

কাজেরই মতো। পাথর সরিয়ে তিনি উঠে পড়েন, মুখে জীবনেরই একটুকরো হাসি। রহস্যময়, কিন্তু অতি তীব্রভাবে বাস্তব। কনস্তানতিনোপল এই সংগ্রামনাট্যেরই এক বসতিময় অ্যাম্ফি থিয়েটার। বছরের যে-কোনো সময় এলে, গালাতা ব্রীজের নীচে, তোপকাপীর চত্বরে বা গরাণবাজারে পুনরুত্থান-অভিলাষী মানুষকে দেখা যায়। এইটিই তাদের পেশা।

ইয়েটস এখানে সন্ত সোফিয়ার গম্বুজে দেখেছিলেন রাজদরবারী কারিগর শিল্পীর হাতে গড়া সুন্দর ও অবিনশ্বরকে। আর য়ুনানী কবি ইয়ানিস রিৎসস তখনও নোবেল বাহবা পাননি। তুর্কী সহযাত্রী নাজিম হিকমেতের মতো তিনিও খুঁজে পান প্রত্যহ-মাত্রিক মৃত্যু ও জীবনের মধ্যবর্তী কোনো কাজ। রিৎসস-এর একটি কবিতা তুলে দিয়ে এই ভিন্নধর্মী ভ্রমণ-রচনা শেষ করছি।

কবির পেশা

করিডোরে ছাতা, বুটজুতো আর আয়না ;
আয়নার মধ্যে স্তব্ধ একখানি জানালা ;
সেইখানে সেই জানালায়
রাস্তার ওপার থেকে ধরা পড়ে
হাসপাতালের গেট।
পরিচিত অধীর রক্তদাতাদের ভীড়, লম্বা লাইন,
প্রথম কয়েকজন ইতিমধ্যেই জামার হাতা
গুটিয়ে তৈরী।
ভেতরের ঘরগুলোয় শুধু,
আহতদের মধ্যে পাঁচজন মারা গিয়েছে।

———

বাংলাপ্ল্যাকর্ড